আমাদের অনাড়ম্বর প্রচেষ্টা

- প্রথম সংখ্যা -

জানুয়ারি ২০২০

প্রচেষ্টা

১ম বর্ষ,
প্রকাশ কাল : জানুয়ারী - ২০২০

সম্পাদক

মানবেন্দ্র পাত্র
উদয় শঙ্কর রক্ষিত

যোগাযোগের ঠিকানা

প্রচেষ্টা গ্রুপ
রাজপাড়া, এড়গোদা
ঝাড়গ্রাম - ৭২১৫০৫
পশ্চিমবঙ্গ

সামাজিক মাধ্যম

Facebook page: Prochesta Edu Tech
Youtube: Prochesta Group
Whatsapp: 9007422922
Website: www.prochestagroup.com

কথোপকথন

৯৯৩২৬২৯৯৮১, ৯৫৪৭০২২০৩৫

চিঠি পাঠাবেন

প্রচেষ্টা গ্রুপ
রাজপাড়া, এড়গোদা, ঝাড়গ্রাম
পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৫০৫

অক্ষরসজ্জা

বিশ্বজিৎ মেটিয়া

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

সঞ্জয় মজুমদার, ঝাড়গ্রাম

বইটি পাবেন

নন্দন ডিজিট্যাল জোন, এড়গোদা
রয়্যাল কম্পিউটার, মেদিনীপুর

বিনিময় - ২০ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

যাঁদের ত্যাগ ও আদর্শ এই ছোট পত্রিকা প্রকাশের একমাত্র ভিত্তি, যাঁদের দ্বারা আমরা প্রতি মুহূর্তে প্রাণিত হই — এই পত্রিকা তাঁদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম ...।

সম্পাদকীয়

সমস্ত শুভানুধ্যায়ী, সদস্য-সদস্যা, পরামর্শদাতা, লেখক-লেখিকা, শিল্পী - সর্বোপরি যাঁদের সার্থক প্রচেষ্টায় এই পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করছে তাঁদের প্রত্যেককেই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমরা আন্তরিকভাবেই চেয়েছি পত্রিকাটি সার্বিকভাবে সুন্দর হয়ে উঠুক। তবু এ পত্রিকায় কোনোরকম অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি বা মুদ্রণপ্রমাদ থেকে থাকলে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

মানবেন্দ্র পাত্র
ও
উদয় শঙ্কর রক্ষিত

কথা প্রসঙ্গে

আজ মনের ভার কিছুটা কমল। অনেক কথা জানলাম। নতুন নতুন শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, বন্ধু-দের সাথে পরিচিত হলাম। এতদিনের অব্যক্ত চাপা ব্যাথার যেন বহিঃপ্রকাশ ঘটল। কাকে বলব ? কোথায় বলব ? কিভাবে বলব ? সবকিছু যেন শুনতে চাইছিল, বুঝতে চেষ্টা করছিল — এই ''প্রচেষ্টা''। শুধু বুঝলেই তো আর হলনা কাজে করে দেখাতে হবে যে — তাই ভিন্ন ধরনের মানসিকতা নিয়েই তো শুরু হয় ''প্রচেষ্টা''। ''কর্ম করে যাও ফলের আশা করোনা'' এতে উদ্বুদ্ধ হয় আমাদের প্রতিটি সদস্য ও সদস্যা। মানুষের পরিবেশ থেকে ঋণ নেওয়া শুরু হয়েছে অনেকদিন আগে। কিন্তু শোধ করার জন্য এখন ভাবা হচ্ছে। মেটাবো কি করে ? তাই গাছ লাগিয়ে, জল ধরে রেখে একটু একটু করে ঋণ শোধের জন্য আমাদের ''প্রচেষ্টা'' চলছে। কিন্তু একটি বা দুটি গ্রামেই নয়, নোংরা, আবর্জনা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলা, জলের অপচয় বন্ধ করা, অযথা প্লাস্টিকের ব্যবহার না করার মতো বিষয়গুলি আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে বোঝাতে চাই যে। এগুলিই কি যথেষ্ট ? প্রচেষ্টা বলে না, সামাজিক ঋণ শোধ করবে কে ? এই প্রশ্নের উত্তর কথায় না দিয়ে মানসিকভাবে আমরা প্রস্তুত হই দরিদ্র, দুঃস্থ, অসহায় ছেলে মেয়েদেরকে শিক্ষার উৎসাহ দেওয়া, বিভিন্ন শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ, সমাজের অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়াদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণের চেষ্টা করি। তবে আমাদের পথ চলার রাস্তাটিই হল —

''শিক্ষা আমাদের উদ্দেশ্য - সাফল্য আমাদের লক্ষ্য।''

কি ভাবছেন। আমি যে আপনাকেও পাশে পেতে চাই। আমরা সকলেই একসাথে হাতে হাত রেখে এগিয়ে চলব — এটাই আমাদের ''প্রচেষ্টা''।

নমস্কার

প্রচেষ্টার পক্ষে

মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী

সূচিপত্র

কবিতা

জগদীশ পাল; উষা মুর্ম্মু; সুনীত দত্ত; রাজা ভট্টাচার্য্য; রাজুরানা দাস; অজয় নন্দী; অনিমেষ সিংহ; পুরন্দর ভৌমিক; যুথিকা মাহাত; তপন বন্দ্যোপাধ্যায়; সুকমল বসু; নগেন্দ্রনাথ রায়; তৈমুর খান; কেশব মেট্যা; সুমন চ্যাটার্জী; অনিমেষ সিংহ; হিমাংশু শেখর মাহাত; রমেশ পালিত; চিত্ত মাহাত; তৃষ্ণা বসাক; স্বপন মল্লিক; সৌমেন মণ্ডল; রেহান কৌশিক; বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়; শুভজিৎ সর; চয়ন রায়; দুঃখানন্দ মণ্ডল; ঝিলাম ত্রিবেদী; পলাশ দে; গৌরব চক্রবর্তী; মানবেন্দ্র পাত্র; বেবী সাউ; সৌমেন সাউ; সায়ন মিত্র; সৈয়দ স্নেহাংশু; লালচাঁদ মান্ডী; মুকুন্দ কর; পতিত পাবন মাহাত; বিপ্লব দত্ত; মান্তু মাইতি; মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী; নিসর্গ নির্যাস মাহাত; শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়; অনুরাধা কর্মকার; সুস্মিতা মণ্ডল

গল্প ও কথা

রাজকুমার ব্যানার্জী; অমিত মাহাত; গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; স্মরণ রায়; বিকাশ রায়; প্রদীপ কুমার মাহাত; জয় সান্যাল; নীহারুল ইসলাম; শুভশ্রী সরকার; তপন সড়ঙ্গী

প্রচেষ্টা

রাজকুমার ব্যানার্জী

প্রচেষ্টা শব্দের অর্থ প্রকৃষ্টরূপে চেষ্টা অর্থাৎ আন্তরিক ও প্রবল চেষ্টা। তবুও চেষ্টা করেও ভুল হয়, ব্যর্থতা আসে। ভুল ও ব্যর্থতা থেকে হয় শিক্ষা আর শিক্ষার পরেই আসে সাফল্য। তাইতো বলাহয় ব্যর্থতাই হল স্তম্ভ-Faliures are the pillars of success.

একবার চেষ্টা করে সাফল্য এলে ভালো, নইলে চেষ্টা করে না-এমন অনেকেই আছে। কেউ কেউ আবার দু তিনবার চেষ্টা করে। কেউ চেষ্টা করে ততক্ষণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাফল্য এসে ধরা না দেয়। এদের কাছে ব্যর্থতা হতাশা আনে না, জিদ বাড়িয়ে দেয় আর জিদ চড়লে সাফল্য আসবেই। মহাপুরুষদের জীবন কাহিনী তারই উদাহরণ। বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার তারই দৃষ্টান্ত।

তবে হতাশার কাহিনীও কম নেই। রবার্ট ব্রুশ ছ'বার হেরে হতাশ হয়ে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। গুহায় একটা মাকড়সাকে দেওয়াল বেয়ে উঠতে দেখলেন। মাকড়সাটা বার বার দেওয়াল থেকে পড়ে গিয়েও চেষ্টা ছাড়েনি। তাই শেষ পর্য্যন্ত দেওয়ালে উঠতেও পেরেছিল। রবার্ট ব্রুশ তা দেখে আবার যুদ্ধে গেলেন। প্রাণপণ লড়াই করলেন। সাফল্যও পেলেন।

পন্ডিত বোপদেবের কাহিনীও ঐ একই কথা বলে। বিফল হয়ে তিনি জলে ডুবে মরতে গিয়েছিলেন। পুকুরঘাটে দেখলেন মেয়েরা কলসী করে জল নিয়ে মাটির কলসীগুলো পাথরে রাখছেন, ঘাটের পাথরটি ছিল বেশ বড়ো। কলসী রেখে রেখে পাথরটির মাঝখানে গর্ত হয়ে গিয়েছিলো। বোপদেব ভাবলেন - মাটির কলসীর ঘর্ষণে যদি পাথরের ক্ষয় হয় তাহলে তিনিই বা পারবেন না কেন ? তিনিই বা মূর্খতাকে জয় করে পন্ডিত হতে পারবেন না কেন ? যেই ভাবে সেই কাজ। প্রচেষ্টা করলেন। নিরলস প্রচেষ্টা, বার বার প্রচেষ্টা - যাকে বলে অধ্যবসায়। জিতলেনও শেষে। হলেন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বোপদেব।

বোকা কালিদাস। গাছের ডালের আগায় বসে ডালের গোড়াতে কাটছিলেন। উজ্জয়িনীর রাজকন্যার সাথে বিয়ে হয়েছিল তাঁর। মূর্খতার কারণে রাজকন্যা তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই মূর্খতাকে তিনি জয় করেছিলেন অধ্যাবসায় দিয়ে - বার বার চেষ্টা দিয়ে। হয়েছিলেন মহাকবি ও নাট্যকার।বহু কাব্য নাটক লিখে সংস্কৃতসাহিত্যে জয় করেছিলেন শ্রেষ্ঠতা ও সম্মান। আজও তাই বলা হয় — কবিষু কালিদাসঃ শ্রেষ্ঠঃ।

মহান ব্যক্তিদের জীবন আমাদের এই শিক্ষা দেয় - আমরাও উন্নততর জীবন জয় করতে পারি - ''Lives of great men remind us, we can make our lives sublime.'' রাজপাড়ার প্রচেষ্টাতেও সেই সত্য উপলব্ধ - সেই বার্তাই অনুভূত। চেষ্টা করো, প্রচেষ্টা চালাও, সাফল্য নিশ্চয়ই ধরা দেবে।

''হাত পা সবার আছে, মিছে কেন ভয় ?
চেতনা রয়েছে যার সে কি পড়ে রয় ?''

ভারতবর্ষ
জগদীশ পাল

নবনির্মিত হাউসের তল থেকে
ভেসে আসছে চাপা পড়ে যাওয়া
মুদ্রিত লিপির কান্না;
সোমবারির শাড়ীর আঁচলে
ঘুমিয়েছি কত রাত; ও বসে বসে কবিতা লিখত

ভালোবাসার কবিতা;
জলের পাতায়
মাছেদের মা হওয়ার কবিতা; কারণ
ওখানে মৃত্যু ছিল না।
শিশুদের সরলতায় সারি সারি
তাল খেজুর দাঁড়িয়ে থাকত
বরণডালা নিয়ে
পাখিদের স্বরলিপিতে বেজে উঠত
আবহ সংগীত।
আজ গাছেদের পাতায় পাতায়
কিসের বিজ্ঞাপন!
ফরমান হাতে দাঁড়িয়ে আছে
অদৃশ্য সেপাই।
এই অশ্রুভেজা রাতে
তুমি আমাদের আলো দেখাও শালপাতার দেশ
আমাদের ভারতবর্ষ

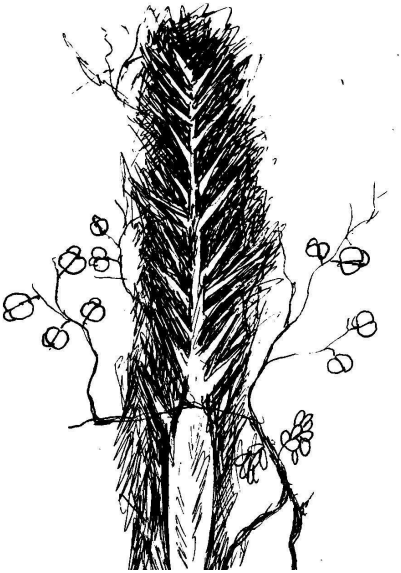

খোঁজ
ঊষা মুর্ম্মু

খুঁজে চলেছি
পিয়াশালের বনে যে চন্দন গন্ধ
রচনা করেছি এককালে

ফিরে এসো বললেই কি
ফিরে আসা যায়
শালিখ জীবনে

বিনিময় যদি বলো
এই পাপিষ্ঠের আত্মার বদলে
হোক সালোকসংশ্লেষ।

দুই কবিতা
সুনীত দত্ত

কবিতা-১

রাজা ওদের তামাক দিয়েছেন
ওরা তাঁকে বনটিয়া দেবে
খাঁচাটি পরিপাটি, ইচ্ছে আছে
শিকল পরাবে

কার শিকল ? কে পরাবে ?
কে পরে ?
লক্ষ টিয়া একসাথে গলা ফাটাবে।
কে ফোটে, কে ফাটে সময় বলবে
টিয়ারা সব চেয়ে আছে ঘাসের পানে

ও ঘাস তোরা কী চাস ?
জীবন না মরণ।

বেহায়া ধ্বজা নামাও রাজা
এখন সন্ধিক্ষণ।

কবিতা - ২

এক খচ্চর
এক গাধার পিঠে চাপলো প্রকাশ্যে
এটাই নাকি দস্তুর এখন
এটাই নাকি সিঁড়ি টপকানোর সহজতম পথ

দৃশ্যতই কালো হলো আকাশ
লজ্জায় বন্ধ হলো সব মুখ
বিদূষক একবার মাথা নত করলেন
তারপর
ধীর পায়ে নদীর পাশে এসে দাঁড়ালেন
এই সেই নদী
যিনি সাক্ষী চির বহমানতার।

তোমরা যারা হৃদয় ভাঙো শব্দ দিয়ে
রাজা ভট্টাচার্য্য

তোমরা যারা হৃদয় ভাঙো শব্দ দিয়ে

তারা কি জানো উপত্যকায় বন্যা হলে
আমারা কাঁদি
আমরা কাঁদি জলোচ্ছ্বাসের প্রবল বেগে
আঘাত কি আর তোমরা বোঝ ?
তোমরা যারা হৃদয় ভাঙো শব্দ দিয়ে

মাথার ভেতর সকাল হবার অপেক্ষাতে
চোখের মাঝে ঘুমের ভেতর জেগে থাকা
সব কবিতা আড়াল হলে
দুর্বিপাকের ভীষণ দোলায় দুলতে থাকা

আমরা যারা পণ করেছি হারিয়ে যাব
যাবার বেলায় তোমার দেখা নাই বা পাব
তবু আমরা হারিয়ে যাব
যেখানে আকাশ পাখি দিগন্ত সব এক হয়ে যায়

আবহমানে সূর্য্য যখন চাঁদ হয়ে যায়

তখন জেনো অপেক্ষাতে হার মানবে তোমার হৃদয়
আমি তখন হৃদয় ভাঙা শব্দ দিয়ে
দুরন্ত সব ছন্দ নিয়ে
গড়ে নেব দ্বিতীয় হৃদয়।

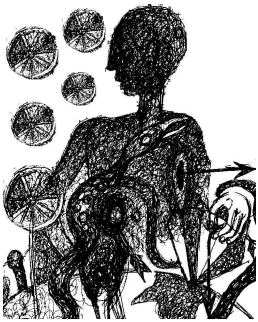

সময় এই
রাজু রানা দাস

মুক্তাঞ্চল চিন্তা কর
বাঁশি বাজাবে কে ?
কাদামাটির মাদকতায়

সবুজ বনপথ
বারুদের গন্ধে পোয়াতি হয়
শিল্পাঞ্চলে অবৈধ সম্পর্ক

ফিসফিস শব্দে
মিশে অন্ধকারে
এখন মেঠো পথ শহর পথ

নিঃশ্বাসে তীব্র বিষ
মুক্তাঞ্চলের স্লোগান ফিকে হয়

দাঁড়িয়ে আছে সময় এই–
ঝুলন্ত বারান্দা ঘাড়ে ভর করে
ভেসে ওঠে সময়
ভয়ঙ্কর ইস্পাত ফলা।

মা আমার মা
অজয় নন্দী

কে হও তুমি, তুমি এতটাই কোমল
যে হাত লাগালেই গলে যাও।
আর এতটাই কঠিন যে পাহাড় চিরে
নদীর মতো প্রবাহিত হয়ে যাও।
তোমার কথা এতই মধুর যে
তা শুনেই অমি ঘুমিয়ে পড়ি।
আর এই কথায় যখন আমার জন্য উঠে
তখন পাথরের মতো ভারী জিনিসকে
তুলোর মতো উঠিয়ে দিতে পারো।
এমন কোন ধাক্কাই নেই যা
তোমাকে পিছনে ঠেলে দিতে পারে,
তার মধ্যেও আশীর্বাদের মতো
আমার মাথার উপর ঝরে পড়তে পারো।
রোদের উত্তপ্ত আভার মতো উষ্ণ তুমি
তার মাঝেও শীতল জলের মতো হয়ে
আমাদের শান্ত করে দাও তুমি।
বুঝতে পেরেছি তুমি আসলে কে
কোন মন্দির থেকে উঠে আসা
ধূপের ধোঁয়া তুমি।
কোন মসজিদ থেকে আসা
ভোরের পবিত্র আজান তুমি।
কোন বিভাজন নেই আর আকাশে
সেই হলে তুমি।
আমার মা হও তুমি, আমার মা তুমি।

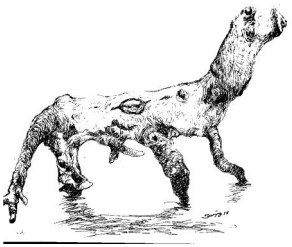

মদ - হুঁস
অনিমেষ সিংহ

লোকটা কিছু বোঝে না। ভাটিখানার কাছাকাছি চাঁদে,
চলে যায় মাঝে মাঝে।
মাটি খুঁড়ে।
পা দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে নিজেও,
নেমে যায় মাটির গভীরে।
দিগন্তব্যাপী মৃত্যুর খবরে তাকে দেখি নি।

তার পরিবার নেই

বউটার সারা গায় নকল সমাজ,
ছিল কোনো কালে!

নকল হয়েছে তার সংসার।

লোকটা মদ খায়,
এবং ভাটিখানার খুব কাছে মঙ্গল গ্রহে,
নেমে আসে মাঝে মাঝে,
হাতড়ায় জীবন
জীবনের বুকে পাখির আজান!
তারপর সামাজিক ক্ষতস্থানে লাথি মারে,
থুতু ছিটিয়ে দেয় আধুনিকতার মুখে।

ঢাক ঢোল বাজিয়ে নকল ঈশ্বর যায় পাশ কাটিয়ে।
সে তখন গণতন্ত্র তুলে ধরে।
সে তখন গণতন্ত্র নাড়ায়।

ভাটিখানার কাছেপিঠে কোথাও একদিন সূর্যটা ঢলে পড়ে
লোকটা সূর্যে নামে। পুড়ে যায়। জীবনটা খুঁজে।

অন্য কোনোকিছু
পুরন্দর ভৌমিক

দমকা হাওয়ার মতো হঠাৎ করে নাড়িয়ে দিলে
ঠিক যেরকম ঠাণ্ডা বরফপাতে শিরশির করে কেঁপে ওঠে
নাম না জানা বনফুল বা রডোডেনড্রন!
পাহাড়ি ঝর্ণার মতো উচ্ছল হয়ে উঠল
চাদর মুড়ি দেওয়া শীতঘুমের কথারা!
ট্রাফিক সিগন্যালে বিপদের যে লালবাতি এতদিন
ধর্মঘটে সামিল ছিল, তারাও এখন
রাস্তা পারাপারে সামিল;
রাস্তার ওপারে কেউ যে সব কথা শুনবে বলে
অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে!

অনেকদিন পর আজ ডায়েরির পাতায় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ল।
অক্ষরেরা বাঁধনহারা নৃত্যে মাতোয়ারা
ডোরাকাটা লাইনের মাঝখানে।
রঙে রঙে রঙিন হয়েছে ক্যানভাস;
রাতের মাইলস্টোনে এ যেন কোন অন্য ভোরের পূর্বাভাস!
তাকিয়ে দেখো- অবুঝ কান্নারা
শিশির হয়ে ঝরে পড়ছে ঘাসের ডগায়...
প্রথম ভোরে ঘুম ভেঙে এক আঁজলা শিউলি ফুলে
ভিজিয়ে নিত হাত সারারাতের শিশিরে!
তারপর তালুর কাটাকুটি রেখায় না হয় লিখব
কোনো আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পাথরের কোলে বসে
নতুন কোন বর্ণপরিচয় বা সহজপাঠ।

জনজাতির বিলাসিতা
যূথিকা মাহাত

গাঁয়ে গাঁয়ে বিদ্যালয়,
সব শিশুরা ভর্তি হয়,
পাঠ নেয় যে যার মতন করে।
চাষার ছেলের লেখাপড়া,
উচ্চ শিক্ষায় জমি বিক্রি করে।
কায়িক শ্রম বাদ দিয়ে,
পাঠে মনযোগ নিয়ে
বাল্য থেকেই বই সঙ্গী ধরে
বি এ এম এ পাঠ শেষে,
রাজ্যে চাকুরির আশে,
চিঠি ফেলে দপ্তরে দপ্তরে।

পিতার শ্রমক্ষমতা গেলো,
ভাত কাপড়ে টান এলো,
মেধার টনক উঠল নাড়া দিয়ে।
টিউশন পড়াতে চায়,
শিক্ষকের অভাব নাই,
মজুর খাটে সুখী গতর নিয়ে
শ্রমের কাজ করিবারে
কেহ নাহি চাহে তারে
রোজ রোজ পায় নাই কাজ।
গাঁয়ে ঘরে থাকা দায়,
পরিবারে অন্ন চায়,
জুয়ান বেটার মনে লাগে লাজ।

মেটাতে পেটের টান,
বুকে লয়ে অভিমান,
ভিন রাজ্যে চলে জংলি মেধা।
শ্রমিকের কাজ পেল
তাতেই সে মন দিল
দুই মুঠা অন্ন হল রাঁধা।
শিশু থেকে সুখী দেহ,
কায়ক্লেশে হয় অসহ,
কঠিন রোগে হইল আক্রান্ত।
বৃদ্ধ পিতামাতা ঘরে,
বৌ বাচ্চার পরিবারে,
ভাতের লাগি হইল উদ্‌ভ্রান্ত।

জঙ্গল মহলে আজ,
উচ্চশিক্ষা আনে লাজ,
গতর শেষে হয় যে সম্বল।
হেথা জনজাতির রুজি,
মজুর শিল্পে হবে বুঝি,
উচ্চশিক্ষা যেন এদের বিলাসিতা কল।।

কবিতার জন্ম
তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

কোথায় আড়ালে ছিলে, কোন নীপবনে
হঠাৎ কবিতা হয়ে হরিদ্রা আঁচল মেলে ডাক দাও প্রকীর্ণ নিশীথে
আঁধার পুঞ্জীভূত, দুহাতে সরিয়ে তাকে ছুঁড়ে ফেলি বহু বন্ধুর পথ
শরীর জড়িয়ে যায় লতাগুল্ম, ঝোপঝাড়ে
কত বাধাবিঘ্ন পথে, অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে কেউ টেনে ধরে সত্ত্বা আমার
কিন্তু মানি না কোনও নিষেধাজ্ঞা, কোনও ঘেরাটোপ,
এগিয়ে চলেছি সেই অধরার দিকে
……ভরা এক আশ্চর্য প্রহেলিকা
ঘোর সম্মোহন, তাকে প্রার্থনা করি
ও কবিতা-প্রেমিকা, একবার ধরা দেবে এ বাহুবন্ধনে
একবার চুম্বন দেবে প্রবল আকাঙ্খা নিয়ে
একবার একবার
অধরোষ্ঠে নিপিড়িত হয়ে আবার লিখব সেই ভুলে যাওয়া প্রিয় পঙ্‌ক্তিগুলি।

মূর্তি নিয়ে অনুশ্চিন্তা
সুকমল বসু

পলকা হাওয়ায় ভেঙে যাওয়ার কথা নয়
সুন্দরীর মূর্তি,
কখনো নিভৃতে আকাশে এই লাইনের
সারাংশ খুঁজেছি বার বার
তারপর মনের পাতা উল্টিয়ে
ঘুমিয়ে পড়েছি
ঘুম মানে একটা সমুদ্র
ঘুম মানে আকাশ বিজয়
ঘুম মানে প্রেতনীদের কান্না
ঘুম মানে পাতালের শব্দ
তুমি আমি আমরা সবাই
ঘুমকে সাদা বেড়ালের মত ভালবাসি।
মূর্তিটা ছিল পাথরের…

মাধবীলতার গল্প
সুকমল বসু

ভগ্নমনোরথ এক মাধবীলতার
কাছে গিয়ে বসলাম
তার সদর্থ ছায়া
পাতার অনেক পরিমিতি বোধের মধ্যে
দেখতে পেলাম
কুশলী হাতে স্পর্শ
কার . . .সে কথা জানার বাইরে
থেকে গেছে।
এই পৃথিবীর মায়া কন্যার কাছে
তার আর কিছু পাওয়ার নেই
মাটির কাতর হাত তাকে
নিয়ে যায় মমতার দেশে
আকাশের তারা চয়নের আগে
সে স্বপ্ন দেখবে – ফুল ফোটাবে
একদিন ঝরা পাতার দেশে
চলে যাবে সেও!

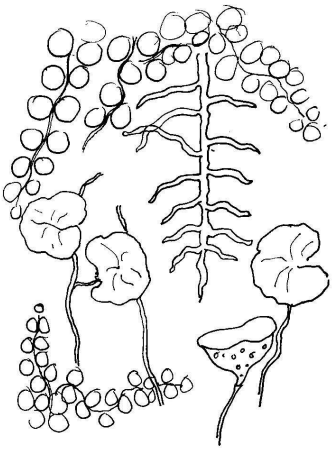

আত্মবেদনা
নগেন্দ্র নাথ রায়

আমি কেন্‌বা ভবে মানুষ হয়ে এলেম
মানুষ হয়ে মানুষের কাজ কিছুই না করিলেম
জ্ঞান থাকিতে হলেম জ্ঞান হারা
বিবেক বুদ্ধি আমার কভু দেয়না সাড়া
কুপথে পথ চলিতে
আমায় বাধা দেয় না কোনও মতে,
একি তব অভিনবত্ব ?
বোঝেনা আমার মন ও চিত্ত।।
দেহরাজ্যে মন রাজকার্য চালায়,
বিবেক বুদ্ধি আর মন্ত্রিত্ব যোগায়
পঞ্চ ইন্দ্রিয় পঞ্চমুখে নিল দেহরক্ষার ভার
ষড়রিপু ডেকে বলে হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার
দেহরাজ্যে লাগে রোল
সবাই বলে হরিবোল হরিবোল
ভেঙে গেল মোর সাধের রাজমহল।।
দেহরাজ্য ভেঙে হল ছারখার
এ জীবনে কেমন করে কাজ করিব উদ্ধার।।

মাছ
তৈমুর খান

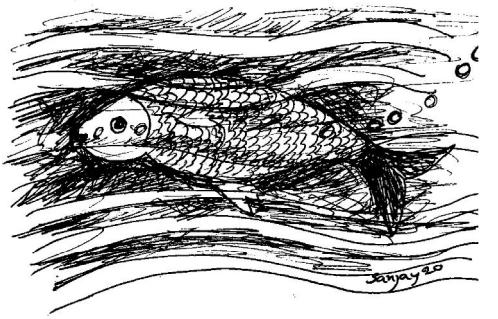

জলের তলায় ডুবে যাচ্ছে মাছ
এমন মাছ কখনো দেখিনি
আমরা স্থলচর
জলের নিকটে যেতে পারি নাকো
ঢেউ গুনে গুনে ঘুমিয়ে যাই।

সারারাত মাছেদের মৈথুনের ঘরবাড়ি
ভরে যায় চাঁদের আলোয়
মাছেরা সিনেমা বানায়
ঢেউ তোলে, রঙিন সব ঢেউ
সকাল বেলায় দেখি চুমু ভেসে ওঠে
চুমুকে ছেঁকে আমরা ঘরে আনতে চাই।

কিন্তু আমাদের জল কই ?
চোখের জলের নদীতে
চুমু নয়
স্বপ্নের মরা লাশ ভাসে।

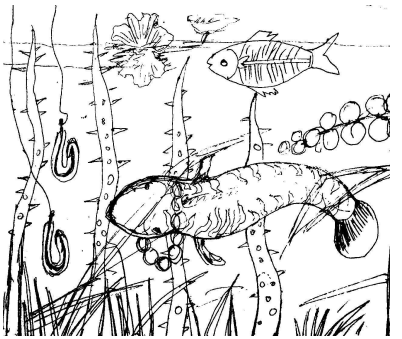

নিহত পথিক এক
তৈমুর খান

পুরানো ছবিগুলি ভেসে ওঠে
গাছের মতো চুপচাপ থাকি
বিহ্বল আত্মাকে জামা পরাই
হা-অন্ন দিনের কাহিনী ডেকে ওঠে।

তবু প্রেমিকার উঠোনে গিয়ে বসেছি
নিঝুম বক
সময়ের স্রোতে কোনো ভিন্নতর মাছ
আসেনি যদিও
বেনদায় কলস ভরে চলে গেছে দিন।

পিপাসা লুকিয়ে চলে গেছি নিরন্তর
ক্লান্ত হাতপাখার বাতাসে
আমার বিশ্রাম জড়িয়ে গেছে

আজ যত হাওয়া দেবে দাও
আস্ফালনের নিচে বসে আছি
নিহত পথিক এক।

আমার উমা
কেশব মেট্যা

আমার উমা পথে প্রান্তরে উমা রাস্তায়-
আমার উমার ভাগ নেই কোনো, ডিনার কিম্বা নাস্তায়।

আমার উমার ভিক্ষের বাটি সারা দেশ জুড়ে ঘোরে
গণতন্ত্রও মিটিমিটি হাসে চোখ বুজে চুপ করে।

আমার উমার অ আ ক খ নেই, নেই ডাক্তার বদ্যি
শৈশব জুড়ে বাসন মাজে-লাঞ্ছিত চৌহদ্দি।

আমার উমার ঘুড়ি নেই কোনো, নেই পিস্তল বন্দুক;
আমার উমা খিলখিল করে কান্নায় ভরা সিন্দুক।

আমার উমার মা বাপ নেই, সবই জানে ঈশ্বর
আকাশ রঙের ছাদটা আছে, নেই উঠোন নেই ঘর।
আমার উমা বড় হয়ে যায়, বড় হওয়া তার ভুল
কুকুর শেয়ালে ছুঁয়ে ছুঁড়ে দেয় শুকনো ছেঁড়া বকুল।
আমার উমার ভেলা ভাসে রোজ অন্য অন্য হাটে
আমার উমার সূয্যি ডুবেছে সোনাগাছি, কালীঘাটে।
আমার উমা প্রতিবাদে নেই, সহ্যের তরুলতা
আগুনে তো সে পুড়ছে রোজই ধর্মের নিরবতা।
আমার উমা চুপ করে যায় নেই তার কোনো শব্দ -
রাষ্ট্র হাসে, মন্ত্রী হাসে-কেমন করেছি জব্দ।
আমার উমা খুন হয় রোজ, সত্যি কথা বলতে,
আমার উমা অন্ধকারের তেলহীন ভেজা সলতে।
আমার উমার জন্য এ দেশ জন্মায়নি তো সত্যি,
পুজোর ছলে পুষেই রাখে - দানব এবং দত্যি।
আমার উমা চিতা থেকে উঠে একদিন ঠিক রাগবে
অন্ধকারের মুখোশ ভেঙে বিসুভিয়াসও জাগবে।

নতুন বছর
সুমন চ্যাটার্জী

রায় বাড়ির সবাই আজ একসাথে আনন্দে নাচবে দুই
ভাই এর যৌথ উদ্যোগে পার্টিও হবে রাতভর
যতই গত মাস ধরে রোজ ওদের ঝগড়া হোক না কেন।
দ্বিতীয় বর্ষের আজ প্রথম দেখা প্রথম দেখা পাবে দিশার,
বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের ভিড়ে।
ট্রেনের হকারটা কাল তার স্বার্থের ২০০ টাকা রোজগার
করতে পারবে না,
পারবে না মেয়ের নতুন বছরের জামাটা কিনে দিতে।
স্কুলের সাদাসিধে মধ্যবিত্ত কেরানি বিরক্তি বোধ করবে,
ছেলের উচ্চ মাধ্যমিকের সময় উত্তেজিত সাউন্ড
বক্সের আওয়াজ শুনে।
বেসরকারি সংস্থায় চাকুরে ছুটির আবেদন মঞ্জুর না
হওয়ায় হতাশ হয়ে কাঁদবে,
বান্ধবীর সাথে ফোনে কথা বলতে গিয়ে।
খোলা মাঠের শেডের পাশে থাকা দিনমজুরদের আজ
রাতে ঘুম আসবে না,
উল্লসিত বাজি ফাটার শব্দে।
দশম শ্রেণীর সাজিম আজ প্রথম বান্ধবীকে চুমু খাবে
অন্ধকার গলিতে
''হ্যাপি নিউ ইয়ার'' বলে জড়িয়ে ধরে।
আমাদের কাছে নতুন বছর খুশির মিলন ঢেউ কারোর
কাছে নতুন বছর কষ্ট খুশির চেও।
আমি ভাবি ঝিকিমিকি আকাশ জুড়ে আলোর,
কারোর কাছে ভয়ের ভবিষ্যৎ কাল।

জাগরণ-২
অনিমেষ সিংহ

এক অতৃপ্ত পৃথিবীতে, জ্ঞানের বোঝা নিয়ে জেগে থাকি।
আমার দেশ, আমার ছিলনা কোন কালে।
সাধারণ মানুষের কোন দেশ নেই।
পৃথিবীটা টুকরা টুকরা করে, আমিও,
আপন বিশ্ব গড়ে নিতে চেয়েছি কখনো।
আর কতো মানসিক ভাবে হেরে ভূত হয়ে বাড়ি ফিরব!
যে যার মতবাদ চাপিয়ে চলে যায় আমাদের ঘাড়ে,
গাধার মতো, মতবাদ বইতে বৃদ্ধ হয়ে গেছি আমরা।
দুটো ডাল ভাত আর শান্তির সন্ধান দিতে তারা সব
শুকিয়ে দিল নদী, নির্বিচারে হত্যা করল বৃক্ষ
পাখিদের স্বাধীনতা নেই আকাশে।
সমস্ত পাহাড় আজ শিল্পপতির।
এখন যেখানে থাকি, তার চারপাশে ধারল সময়,
অতিরিক্ত রাষ্ট্রপ্রেম নিয়ে জল্লাদ ঘুরে বেড়ায়।
মাটির গভীরে চলে যাব শুভ্র শিকড়ের মতো,
তাও তো আমার নয়।
খনিজ পদার্থেও লেখা নাম বনিকের।
জেগে থাকি,
পথ ও পাথরের মতো জেগে থাকি।

শরৎ এলো কাশের বনে
হিমাংশু শেখর মাহাত

শিশির খুশী কাশের বনে এসে
শরৎ হাসে সাদা মেঘের কোলে
তলব দিল মুক্তোঝরা দিন
বাতাস হারায় স্বপ্নে ঢাকের বোলে।

ওই যে সেথা মনের আলো জ্বলে
ধূসর মাটির গল্পে অকাল বোধন
মাতৃরূপে বাঁধন হারা ক্ষণে
জরির সুতোয় স্রষ্টা অন্তহীন

অষ্ট প্রহর শূন্যতা নেই মাঝে
রাত মুছে যায় চোখের তারা খুস
ধিমি পায়ে প্রেমের নিরাময়
হৃদয় গাঙে পূজা নিরঙ্কুশ।

আমি এবং আমার অনুভূতিতে নারী
রমেশ পালিত

‘বাবা’
শব্দটি আমার কাছে পরিহাস মাত্র
চেতনার চিলেকোঠা জেগে ওঠার আগেই
জন্মদাতা মহাশূন্যে মিলিয়ে গেলেন
কোনোদিন সৃষ্টি কর্তাকে ‘বাবা’ বলে
ডেকেছি বলে মনে পড়ে না বড় ইচ্ছে করে
‘বাবা’ ডাকতে। কতদিন যে নীরবে চোখের
জল ফেলেছি! গুমরে কেঁদেছি বালিশে মুখ ঢেকে!

জীবনের শুরুতেই যে নারীকে আমি চিনেছি
তিনি আমার গর্ভধারিণী
আমার নাড়ির বন্ধন
আমার আত্মার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ
আমার দেবী।

নারী তাই প্রথমতো আমার মা
দ্বিতীয়ত আমার পরম বন্ধু
আমার প্রিয়া
সুখদুঃখের সাথি
মায়ের কাছ থেকেই আমি প্রথম
নারীজাতিকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছি
শিখেছি ভালোবাসতে

নারী হলেন প্রকৃতি
তাই প্রকৃত প্রস্তাবে
নারীই জগতের ধারক ও বাহক . . .

আমার অনুভূতিতে নারী এক শুদ্ধ সত্তা
যেন এক জীবন্ত প্রতিমা!

অন্তরালের অভিব্যক্তি
চিত্ত মাহাত

বাইরে যাওয়া দেওয়াল ভাঙছি
খুঁজছি জিহাদি ভাষা,
আলোয় ফেরার প্রহর গুনছি
বন্দী মনের ক্রমশ প্রত্যাশা।
বিশ্ব মানব সকল থাকে পড়ে,
হয়না তবু তাদের কাছে যাওয়া
ভাবনাগুলো উড়ছে প্রলয় ঝড়ে
শিরায় বইছে কোন বিদ্রোহের হাওয়া।
এতদিনের অন্ধকারে ভেঙেছে সংসার
পায়ের তলায় মাটি গেছে সরে,
দুর্ভেদ্য আড়ালে ওঠে ক্ষুধার্ত চিৎকার
হীন রাজনীতি ছিন্নভিন্ন করে।

বর্ডার
স্বপন মল্লিক

ওই যে দেখুন
কাঁটা-তারের বেড়া টপকে
এক-ঝাঁক পাখি
উড়ে যাচ্ছে দূরদিগন্তে

ওই দেখুন
এক-দঙ্গল বাতাস আমাদের ঘরে ঢুকল
বর্ডার-শাসনকে তোয়াক্কা না-করে

আর দেখুন
গঙ্গা পদ্মা কী রকম মিলেমিশে
একাকার
একই সাগরে

আপনারা আমাকে যেভাবেই বোঝান
আমি মানি না আপনাদের
বিভাজনের তত্ত্ব
একই আকাশে

ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের মন
একই সূর্যের আলোয় আমরা দীক্ষিত
আমরা একই সংস্কৃতির
ধারক ও বাহক...

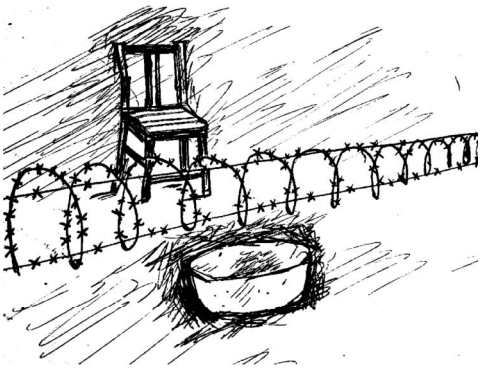

সাদা হাওয়া ও নানারকম ঘাস
তৃষ্ণা বসাক

ঘাসকে বাড়তে দাও, জানালা ছুঁয়ে নুয়ে এসো ঘাস।
তোমার উপরে এই কাহিনী দাঁড়িয়ে রয়েছে।
ঘাসের তলায় ঘাস, ঘাসের ওপরে ঘাস
ঘাসেরা অনেক ভাই বোন....
উপকথা আছে আর কিশোরীর মাথার বলয়,
কবেকার সিঁড়ি আর সিঁড়ির ঘোরানো রেলিং
বাড়ি নেই কিশোরীর। সূর্যের আলোয় তারা খেলে
চুল বাঁধে, কাঁটাফল গোঁজে কবরীতে।
অজস্র পোষ্টকার্ড লেখে, তারপর দুরদুর বুকে
ভাবে বুঝি উড়ে এল সিঙ্গাপুর যাওয়ার টিকিট!

ঘাসকে বাড়তে দাও, সুগন্ধী ঘাসের চটি পরে
পেছনের দরজা খুলে হাড়ে ঢুকে যায় সাদা হাওয়া,
বাগানের পাতিঘাস গতজন্মে কাঁটাতার ছিল
ক্রুর চোখে দেখে তারা এভাবে সীমান্ত ভেঙে যাওয়া!

ঝরা পাতা
সৌমেন মণ্ডল

রাতের বেলা পাতা ঝরার
মর্মর শব্দ শুনেছি,
শুনেছি তাদের করুণ আর্তনাদ...

বসন্তের রাতে এলোমেলো বাতাসে
তাদের বাঁধন ছেঁড়ার শব্দ শুনেছি
শুনেছি মাটিতে পড়ার বিষাদ।

হলুদ ভালোবাসার ছায়ায়
গন্ধ মেখেছি সারা দুপুর

মেলেছি চোখ পাতার হলুদে
শুনেছি তার পায়ের নুপুর

তার অসীম ভালোবাসার টানে
ছুটে আসি বারবার

জানি না কি আছে তার মনে
বসন্তের ব্যকুলতা
না-কি শুধুই রঙের বাহার!

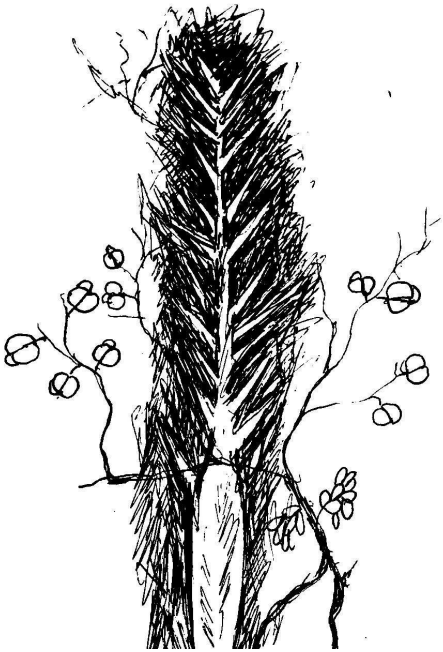

পুনরায়
রেহান কৌশিক

নিজের ভিতর নিজে বসে আছি প্রগাঢ় সন্ন্যাসে
শূন্যদেশে ছায়া ওড়ে শুধু।
এ এখন কোন ঋতু, পৃথিবীর বুক থেকে
জন্ম শব্দ উড়ে আসে বাতাসে-বাতাসে

যতটা বিষাদ তুমি দিয়েছিলে প্রকৃত বিচ্ছেদে
লতা আর হরিণের শিং হয়ে যত দুঃখ
বসেছিল জড়াজড়ি করে -
সে সমস্ত মুছে ফেলে নতুন আনন্দধ্বনি
সাজিয়েছি অক্ষরে অক্ষরে . . .

এই সন্ন্যাস, মৃত্যুর পর্ব
দাহগানে লিখে রেখে পুনরায় ফিরে যাব
জল আর জমিনের দিকে
হলুদ ধানের পাশে তুলব প্রেমিকের ঘর।

বিষাদের পাশাপাশি, প্রতিটি জন্মের কালে
তোমার স্পর্শে চেয়ে কে বেশি দিয়েছে আর আশ্চর্য আদর ?

ছায়া দীর্ঘ হয়
বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়

পায়ে পায়ে হেঁটে যেতে যেতে দীর্ঘ হয় পথের মহিমা
প্রতিটি মুহূর্ত যেন পলির সঞ্চয়
শাশ্বত অক্ষরে লেখে লিপিবদ্ধ শস্য সম্ভাবনা
প্রতিদিন জমে ওঠে স্মৃতির সম্বিত।

পায়ে পায়ে নয় বছর
চিন্তার ফসল
সমৃদ্ধ করেছে তাকে দীর্ঘ চলাচল।

অন্য বিষাদ আরও দূর যেতে হবে
বহুদূর ব্যপ্ত হয়ে আছে তার ইপ্সিত আকাশ

একদিন ঠিক তুমি ছুঁয়ে ফেলবে স্বপ্নের মাস্তুল।

জলের নামতা
বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়

এই যে ছুটে আসে রাশি রাশি প্রাণবিন্দু
আর তার চারপাশে লুকানো দুঃখের রঙ
গোড়ালি ডুবিয়ে কেউ ছুটে যাচ্ছে
ওর নাম রাঙা মাসি
তুমি তাকে দেখেছো কখনও ?

সহজ জলের ম্যাজিকে
সেতু ডিঙিয়ে সেও চলে গেছে শ্রাবণরেখার পারে
গুন গুন করে তার মেঘগান বাজে

জলের নামতা শুনি
বৃষ্টির নির্জনে।

অ – সুখ
চয়ন রায়

খিদে পোড়া মানুষ
বাদামী দাঁতে বাতাস চিবোয়

ধরনীর কষ্ট হয়
অমারও হয়

এ বড় সুখের যন্ত্রণা

অভিমান
শুভজিৎ সর

একটা তুমির জন্যই হেটে চলা
শিউলির গন্ধে অন্তহীন গানগুলো ভোরবেলা গন্ধ শুঁকে,
কে বেশী কল্পনায় গড়া
শুরু হয় কম্পিটিশন...
দূরে থাকার অভিনয়গুলো
একটা গোলাপের দিকে তাকিয়ে থাকে
তুমি একটা বিষাদ,
নোনাজল ছিটিয়ে বাঁচিয়ে রাখি...
তুমি যতদিন থাকো
স্বপ্নেরা ততদিন থাকে,
স্রোত ভেঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছো
পারলে তাকিও পিছন ফিরে....।।

বুক পোষ্ট
জগদীশ পাল

এবার পুজোতে তোমার
জন্য
একটা আকাশ পাঠাবো
শাড়ীর মতো করে পরবে
দেখতে পাবে আমার ঘর সংসার
গৃহস্থালী।
হাতের লাগানো লেবু গাছটায়
দেখবে
কত ফুল এসেছে।
এবার পুজোতে তোমার
জন্য
একটা আকাশ পাঠাবো।

আহুতী
দুঃখানন্দ মন্ডল

কেমন করে শেষ হয়ে যায় একটি দিন
ফিরে আসার পথ এক সময় নির্জনতা স্পর্শ
করে।
অনবরত কে কাঁদে! শ্রীখোলের সুরে কৃষ্ণ
নাম মাখা
এত ব্যস্ততা কেন ওকে ঘুমোতে দাও আরো
কিছু সময়।
ভাসান হবে, জোর লাগিয়ে নামো পাড়ে
সাবধানতা তোমার কাছে শীতের রাত এখন
সবে ।
কান্নার রোল মিশে হরির শব্দ বোলে
সুজন আর ফিরবে না আমার ডাকে।

সময় পুড়ে যাচ্ছে!
শরীর অদৃশ্য হচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে প্রতিমা
কিছু মানুষ উল্লাসের তাগিদে ভুলে
যায় মৃত্যুকথা
নাভিকুন্ড তোমায় দিলাম বিসর্জনের ঘট
রেখো যত্নে।

একটি কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে
তোমার ভাঙ্গা বাক্সে গচ্ছিত লাল শালুতে
ভাগবৎ গীতা
মাটির স্পর্শ লাগবে তোমার শরীরে কানে
বাজে শঙ্খধ্বনী
তোমার আত্মা নিরুদ্দেশের পথে আর এক দেহের সন্ধানে।

ঋণী আমি
ঝিলম ত্রিবেদী

কিছু দেনা না হয় রইল
অসামান্য আঁধারের মত কিছু ঋণ - না হয় রইল
অপরিশোধ্য
অবোধ্য
কিছু ঋণ
সন্ধ্যের দোকানের পাশে
বসে থাকে নগরের রূপ
এলো এলো কথার মুকুট
পরেছে পরেছে আজ আমাদের সকলের শীত

আর কিছু দেনা বড় বেড়ে চলে, গঙ্গার জলের আঙ্গুলে
দেনা থাক
পড়ে থাক
ধুলোয় মলিন কিছু দায়
আজান গভীর হলে তোমার মুখের মত লাগে -
এ তো মিথ্যে নয়!

নাড়ি
পলাশ দে

ধূপধুনো দিই, গঙ্গাজল,
নিশুতি ডাক পেরোতে কার্তিক আলো টাঙাই ছাদে
আঁশটে ঘ্রাণ যায় না তোমার আঁশটে ঘ্রাণ যাচ্ছে না

জলের গ্লাস-বারান্দা-ফটো অ্যালবাম
ঠোঁটের লালন থেকে ন্যাপথলিন মোড়া পোশাক
জগৎ জুড়ে লোডশেডিং

জোনাকি যায় না তোমার জোনাকি যাচ্ছে না উপোসে

মাটি রাস্তা পর্যন্ত পেখম ঝোলানো

কচুরিপানা ফুল . . . লতানো সাপ ও ডাহুক
কোথাও বেড়াতে যাওয়ার বাঁশি পাইনা আজকাল

মধু মধু কান্না আসে হরিণ হরিণ ভয়
নাড়ি ছিন্ন হয়না তোমার কিছুতেই ছিন্ন হচ্ছে না নাড়ি।

বিশ্রাম
গৌরব চক্রবর্তী

তোমাকে দেখে যাওয়াটাই হল কাজ- সেটাই নিয়তি
চোখ দু'টো একদিন চেয়ে চেয়ে তোমার পায়ের কাছে
খসে পড়ে যাবে
তুমি পা নেড়ে, ধুলোর মগ্নতায় ঝেড়ে ফেলবে আমার সমস্ত চেয়ে থাকা
তারপর, বহুদিন পরে সেই ধুলো, সেই চোখ, সেই চেয়ে থাকাগুলো
যখন প্রসবিনী হবে পুনরায়–
এদিকে আমার অপেক্ষাটুকু নিয়ে হাট-খোলা অন্ধ আমিও–
দেখতে পাইনি এতদিন কত আলো এসে মিলিয়েছে দৃষ্টিতে তোমার,
দক্ষিণের পাল্লা রেখেছি খোলা
হাওয়ায় আকাঙ্ক্ষাটুকু পুরে দিয়ে বার্তা ছেড়েছি
এসেছে ডাক
এই এতদিন পর —
তোমার সমস্ত কাজ ফেলে রেখে এক দৃষ্টিহীনের দিকে তাকিয়ে রয়েছ
শুধু তোমার চোখ দু'টো আমার বুকের ভেতরে দপদপ করে ওঠে।

বাঁশি
মানবেন্দ্র পাত্র

কথাকলি আর কত্থক
মাঝরাত্রি, আকাশময় অভিসার।
কখনো বিন্দু, কখনো সম্মোহিতাকে
পাশাপাশি রেখে
যাজক হয়ে উঠেছে।

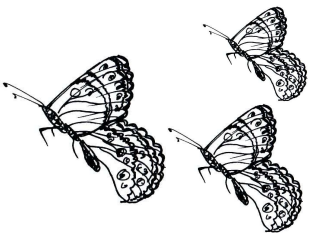

মন্দিরে, পূজায়, অহ্নিকে
অনেকগুলো পাখি।
আমাদের অনুপম শুধুই পথ।

মকর ধ্বজ ওড়ার কালে শামুখের
জীবনচক্রেও এরকম শীতকাল আসেনি
এইমাত্র চাঁদ আঙুল ছুঁলো।
তরল বিস্তারময় বাঁশি...

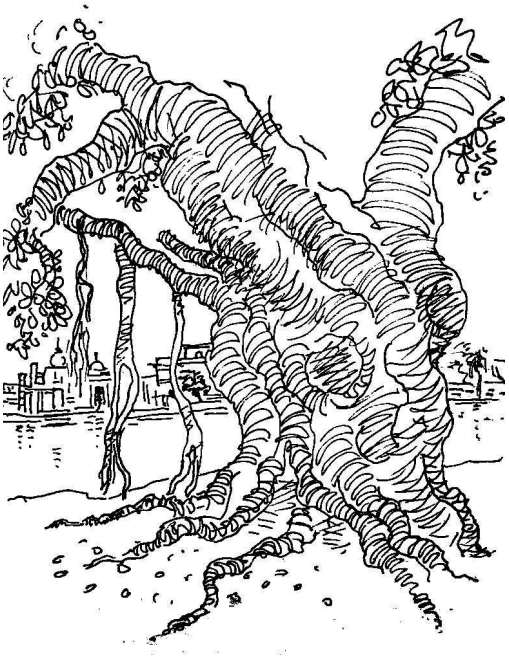

প্রাচীন
বেবী সাউ

১

হ্যাঙ্গারে ঝুলে বিবর্ণ কাপড়
ছেঁড়া হেমন্তের এই বিকেলে সরসর শব্দে হেঁটে যায় বৃদ্ধ তক্ষক
জঙ্গলে আগুন জ্বলছে
পাতা উড়ছে
অর্জুনের বাকলে শেষ প্রহরের ছাপ
মুক্ত আর রুদ্ধদলের ক্ষতচিহ্নে
ছুটে আসছে চন্দ্রাহত সাপ।

২

তুমি নেই বলে, হেমন্তও খাপছাড়া কিরকম!
বিষন্নতার নক্ষত্র ঝরে ঝরে পড়ছে
আমি সাত ফুল, ফলের নাম গুলিয়ে ফেলছি ক্রমশ
দিস্তা দিস্তা সাদা কাগজে শীতের হিম
এতকিছুর মাঝেও ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে ময়ূর
কাক উড়ে যাচ্ছে...

রূপসী রোদ
সৌমেন সাউ

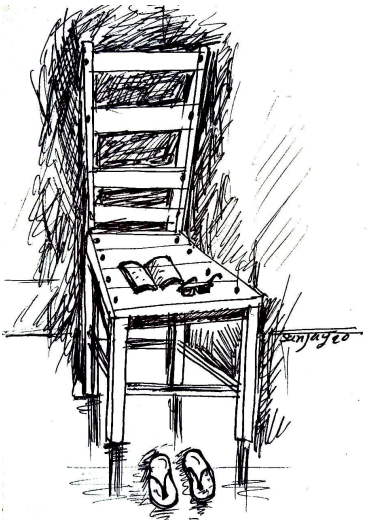

নির্বাণের পথ বলে কোনোদিন কিছু ছিল না
কেউ জানে না
হঠাৎ কেন লাল আলো জ্বলে উঠে নিবে গেল
হঠাৎ কেন সবুজ আলো জ্বলে উঠে নিবে গেল
কোথাও নেই হেমন্তের ট্রাফিক পুলিশ।
বেরিয়ে পড়ার সব পথ বন্ধ দেখেও
একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে বেরোনোর পথ
খুঁজছি হা ঈশ্বর
এখন মাথার ওপর রূপসী রোদ ছাড়া
আমাদের আদর করার মতো কেউ নেই।

কে জানে কত দিন
সায়ন মিত্র

কে জানে কত দিন ধরে –
ভেসে যাবে মন, অনাহত জোয়ারের স্রোতে;
মেঘের ছায়ায় - শুকনো গাছের ডালে দেখবে মরীচিকা
অজস্র বৃষ্টির ফোঁটায়

কে জানে কত দিন ধরে -
তালপাতার মানুষ গড়বে বিকেলের সূর্য,
ভেসে যাবে কান্না - রাতের কুয়াশা হয়ে
জ্যোৎস্নার অন্ধকারে।

কে জানে কত দিন ধরে –
বেদনার অভিসারে ধান কাটা হবে হৃদয়ের,
উন্মুক্ত দিগন্তে বারবার জন্ম নেবে
তালপাতার মানুষ।

কে জানে কত দিন ধরে -
শুকনো গাছের মরীচিকায়
পূর্ব জন্ম নেবে
অজস্র বৃষ্টির ফোঁটায়।

''আদম পরিচ্ছদ''
সৈয়দ স্নেহাংশু

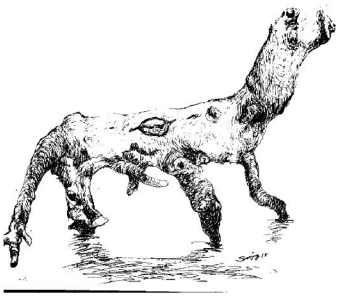

আসলে আমি পাপ করেছি পান...
বিন্দু হয়ে যাওয়া ঘুড়ির সাথে সুতোর যে টান
বঁড়শী গেলা মাছের মাঝে ছিপের যে টান
ঘুম থেকে চোখ মেলার আগে অবিকল সেই টান
অনুভূতিতে গোলমাল মাপে মধ্যাকর্ষণ অবিরাম
আসলে আমি পাপ করেছি পান
শ্বাস প্রশ্বাসে সিঁড়ি-ভাঙ্গে নিষেধ ফলের ঘ্রাণ...

বেলা থাকতেই বেলপাহাড়ী
লালচাঁদ মান্ডী

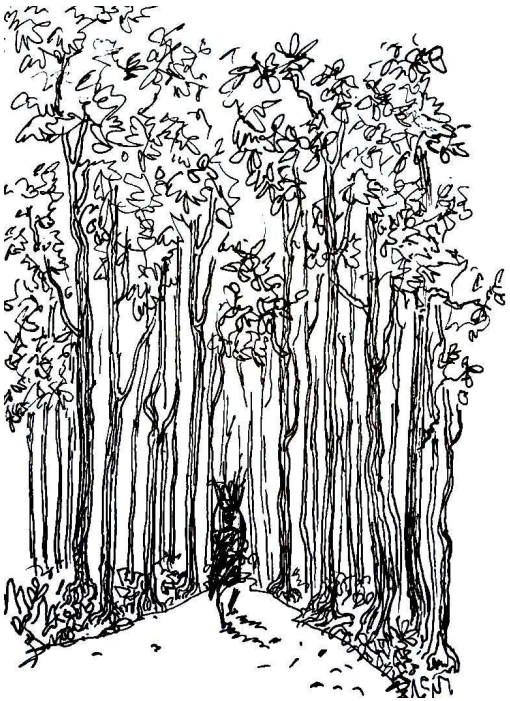

অলি গলি শহর তলি
সাধের ঝাড়গ্রাম
প্রকৃতির মাঝে সবুজের ছোঁয়া
ভরিয়ে দেয় প্রাণ।
ছোট ছোট ডুংরি আর
শাল শিমূল-এর বন
খুঁজছি আমি নতুন ঝোরা
হারিয়ে যেতে মন
বড় ভালো লাগে ঢাঙ্গি কুসুম
আদিম লালজল,
দেখছি তাদের জীবন ধারা
খাদ্য মূল আর ফল।
সবুজের মাঝে কালো রাস্তা দিয়ে
যাও যদি কাঁকড়াঝোর
রঙ তুলি দিয়ে সাজবে আকাশ
দেখবে মায়াবী ভোর।
গাডরাসিনির উপর থেকে
থাকবো আমি চেয়ে,
ভাবছি কত জল বয়েছে
এই উপত্যকা দিয়ে।

রাখীর মান
পতিতপাবন মাহাত

পারবি কী ভাই দাম দিতে তুই ? ?
রাখবি কী আজ রাখীর মান ? ?
দিকে দিকে বাড়ছে যে রকম
মনুষ্যত্বহীন কামের পাপ।।
সুরক্ষিত নয় কোনো নন্দিনীই
দিনে-দুপুরে একলা পথে,
হচ্ছে শিকার প্রতি নিয়তই
পুড়ছে পুরুষের বিকৃত কামে।।
আর কতদিন!!আহুতি দিব!!
ঘরে বাইরে পরাধীন ভাবে ?
রাস্তা ঘাটের অত্যাচারে ? আর-
শ্বশুর বাড়ির দাবানলে ? ?
ভদ্র সমাজে শিক্ষিত সবাই
আমরা কেন শুধুই কামিনী ? ?
কামের উর্ধ্বেও পরিচয় আমার
হয়তো জননী; স্নেহের ভগিনী।।
স্বার্থপর সমাজে আশার প্রদীপ
একটি মাত্র আছিস তুই।
তোর কাছে ভাই, নিরাপদ আশ্রয়
আমার জীবন বাঁচাবি তুই।।
দাম দিবি ভাই হলুদ সুতোর
রাখবি বোনের মান
অত্যাচারিত দেখলে কোথাও
আগলে বাঁচাবি প্রাণ।।

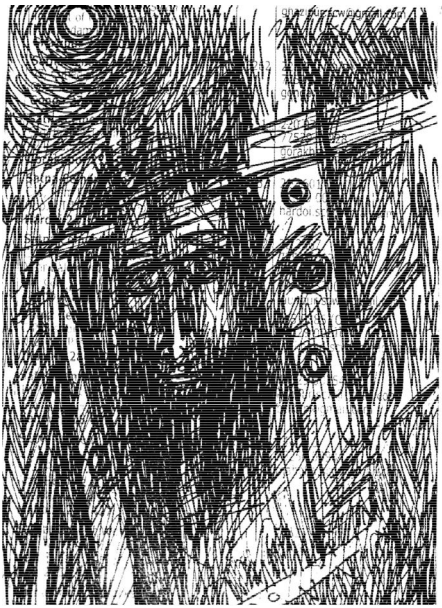

আমরা
মুকুন্দ কর

বাঙালী আমরা – বাস করেছি এই বঙ্গে
ভালোবাসার বন্ধনে শত্রুতা মিশেছে সঙ্গে।
মা ও সন্তানের দৃঢ় সম্পর্কে জাগে মনে প্রশ্ন
একই মায়ের সন্তানের রক্ত কী হয় ভিন্ন ?
যে সম্পর্কের হয় না কাগজ টুকরো সার্টিফিকেট
পথের ধারে ধূলা মলিন বুভুক্ষু খালিপেট।
পরিবর্তনের ধারায় এসব ভাবনা থাকে অল্প
জাত বিচার নিয়ে ব্যস্ত সভ্যতার সংকল্প।
জাতির বীজমন্ত্রখানি ক্রমে সবাই যাচ্ছে ভুলে
মানুষের ভেদাভেদ নিয়ে মানুষই ঝড় তুলে।
দেশপ্রেমে খাদ ছিল না তাই তো দেশ হল স্বাধীন
জাতিপ্রেমে ভীষণ খাদ সমাজ তাই বেরঙীন।

হে মানব, হে মানবী
বিপ্লব দত্ত

ব্যস্ত, কাঁকর, লালমাটি
আর
পথের ধূলা আজ।
ব্যস্ততার সূচাগ্রাঘাতে
মৃত প্রকৃতির সাজ।।

নগ্ন; বিবর্তন, সভ্যতা
আর
শালীনতা আজ।
উদ্যমী কামাঘাতে
হৃত মানবিকতার লাজ।।

মলিন; বিবেক; চেতনা
আর
সরলতা আজ।
-কেন্দ্রিকতার স্বার্থাঘাতে
ক্ষত সৌভ্রাতৃত্বের কোলাজ।।

হায় রে মানব-হায় রে মানবী
যুগোপযোগীতার দানব-দানবী:
অনেক হয়েছে আর কত বিষবি ?

এবার না হয় থাম।

মনে পড়ে কি সেই দাবানল,
ঝলসানো পশু আর ছাল সম্বল;
যাদের অভিযোজনের আজ তোরা ফল।

নদীপাড় থেকে গ্রাম আর শহর,
প্রস্তর থেকে সভ্যতায় উত্তরনের সমর।
ফিরে তাকা তবে যাস না ঘুরে
মেলাস না স্বর পশ্চাদমুখীতার সুরে।

এগিয়ে চল।
মানবিকতার সোপান ধরে।
প্রকৃতির ছন্দে তালে আর সুরে।
ব্যস্ততাকে সুবল করে।
সৌভ্রাতৃত্বকে সঙ্গী করে
তারা তো শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির দল।

তালপুকুরের পদ্যকথা
মান্তু মাইতি

তালপুকুরের তেঁতুলগাছে বসেছে এক মেলা,
হরেক রকম পক্ষীরা সব করে সেথায় খেলা।
কেও বা ওড়ে, কেও বা দোলে ঠ্যাং দুলিয়ে গাছে,
কেও বা আবার গানের সুরে মত্ত হয়ে নাচে।
মাছের সাথে মাছরাঙা খেলায় যে তার ঠোঁট,
একটি নয়কো দুটি নয়কো আটটি সর্বমোট।
কোকিল বসে একপাশেতে, আছে তার মুখ ভার,
বেলা হয়ে এল অনেক গিন্নি বোধহয় আসবে নাকো আর।
চ্যালা সমেত কাক সর্দার আঁটছে নতুন ফন্দি,
রাজ্য ক্যামনে করবে দখল, ক্যামনে হবে সবাই বন্দি ?
লেজ দুলিয়ে টুনটুনি বলছে সবাই শোনো,
ডিগবাজি সবে দিলাম তিনটি বাকি তোমরা গুণো।
শালিক পাখি দিয়ে ফাঁকি আছে গাছের কোনে,
আছে তার অনেক জায়গা মাঠে হোক বা বনে।
কাঠঠোকরা রাগের বশে দিচ্ছে গাছে মার,
তারে সবাই করছে যে পর, তাই শিক্ষার দরকার।
বকটি আছে মুখ বাড়িয়ে জলের ধারে বসে,
করা শিকার খুব দরকার নয়তো মরবে নাকি শেষে ?
ফড়িং রানী জলের উপর দেখে যে তার মুখ,
আপন রূপে মোহিত হয়ে গর্ব ভরে বুক।
সুখ দুঃখেতে সবাই মিলে করতো সেথায় বাস,
শয়তানদের নজর পড়ল সেথা, সুখের হল নাশ।
বড়ো বড়ো যন্ত্র এলো তালপুকুরটা বুজল,
সবহারারা সব হারালো, বাঁচার আশা খুঁজল।
মায়ের বদলা আসবে ঠিকই, হবেই তাদের পতন,
সন্তানদের মা রাখবে বুকে করবে তাদের যতন।

ধারাবাহিক
মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী

সেই কবে থেকে...
ছুটেই চলেছি, পথ নেই থামবার।
সকাল থেকেই চলে ডাকাডাকি —
কেউ বলে আছে শাড়ি,
কেউ বলে গাড়ি, বাড়ি,
আছে আরও কত কী,
বাচ্চারা–সব দেখে মন ভরে,
একজনও কি নেই কিনবার ?
উকিল কহে, আমার মক্কেল অপরাধী নয়, শুনুন ধর্মাবতার।
ডাক্তার বলে, এ অসুখ বড়ই কঠিন, তবে টাকা চাই সারাবার।
পুলিশ ছুটে উঁচিয়ে লাঠি,
গ্রামের মানুষ কর্ষায় মাটি,
চারিদিকে আওয়াজ, শুধু ধর্ষিতার।
হো হো করে হেসে উঠে,
টাকা কড়ি নিয়ে সাথে,
ঘড়ি দেখে ভুল ভাঙ্গে,
কোন আওয়াজ সে পায়নি যে আর।
সেই কবে থেকে...
শুনেই চলেছি, ইচ্ছে হয় আরও জানবার-
মোরগ কেন ডাকে ভোরে ?
শিক্ষাকে কেন ব্যবসা ধরে ?
নেতারা কেন ঘোরে দ্বারে ?
নিতাই কেন গান শোনায় মানবতার ?

অভিজাত
নিসর্গ নির্যাস মাহাতো

দ্রৌপদীর সম্ভ্রম রক্ষা করেছিল যে কৃষ্ণ
তাকে সখা মান্যতা দেয় রাজকুল জাত
আসলে সম্পদ রক্ষার্থে মেনে নেওয়া শুধু
কটা গৃহবধূ পায় অধিকারবোধ।

শিয়রে শমন
শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

এই পৃথিবীর ভীষণ অসুখ, সারাবে কার সাধ্যি।
যুদ্ধ করে পাচ্ছে নোবেল বাজাও রণবাদ্যি।।
এই পৃথিবীর বীভৎস জ্বর পরমাণুর উত্তাপ।
হস্তপদ বিকল হলো হৃদয়ে নাই সন্তাপ।।
এই পৃথিবীর বয়স হলো ভীমরতিতে ভুগছে।
নিজের কবর নিজেই খুঁড়ে উল্লাসে লক্ষ দিচ্ছে।।
এই পৃথিবীর শিয়রে শমন জবাব দিলো ডাক্তার।
এই পৃথিবী ধ্বংস হবে কে করবে তার সৎকার।।

দাম কমেছে
শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

দামি হলো আলু-পেঁয়াজ, কুলীন কাঁচা লংকা।
মাছ, মাংস খেতে কি আর পারবো - মনে শংকা।।
ডাল দিয়ে ভাত মাখা এখন স্বপ্ন কথা প্রায়।
পোস্তবড়া, বেগুন-ভাজা রাজা বাদশা খায়।।
গায়ে-মাথায় তেল জোটেনি, শাক-পাতার ছেচকি।
মানুষ হয়ে পশুর মতো এমন বাঁচা যায় কী ?
দাম বেড়েছে সব জিনিসের, সবই এখন দামি।
দাম কমেছে মানুষেরই - সে যে অধোগামী।।

একটা ঘটনা / সমাজ

সুস্মিতা মণ্ডল

শুধু একটা ঘটনা ধর্ষণ।
একটা ঘটনা, আবার ঘটবে
একটা হ্যাসট্যাগ আবার পড়বে
একটা ট্যুইট, একটা পোস্ট, একটা ফরোয়ার্ড
মোমবাতি মিছিল, সেলফি প্রোটেস্ট, একটা আউটরেজ,
তারপর সব শান্ত, অসমাপ্ত বিচার
কিছুদিন সব চুপচাপ, খুবই ভালো
কিন্তু না, অন্ধকার রাত, রাত হোক বা দিন
আবার ঘটবে সেই ঘটনা, নষ্ট হবে একটা জীবন,
কেউ বা করবে আত্মহত্যা, কেউ মুখে চুনকালি
কিন্তু দোষটা কি তার শুধু মাত্র মেয়ে বলে
কিন্তু বিচার আজও অসমাপ্ত, নিয়ম তৈরি হয়ে আজও হলো না
ধন্য সমাজ ধন্য তুমি দোষীরা সব হাওয়া খাচ্ছে
নির্দোষীরা প্রাণ দিচ্ছে।।

জীবন
অনুরাধা কর্মকার

GãUR bï] á* @ü«] ÿwj# ãdZ â^ Aą
* ï@üãRï Wyí Yí Nyá P< Rá
GãUR b] * @üRPą
Yą[BãNy bą[ãNy áP< Rãñ
GãUí RX[peüUaR b] a XZ,
Yá* ï@üUã[# Syï Z @ü[Rãñ
GãUR b] * @ü# ãRnPXZ,
Yá@üjÿãP< Rãñ
GãUR bï] áWyã] ãUáa ą
Yã@üCçyá@ü[Rãñ
GãUR b] * @ü«] ÿwyX Z a ãð
Yã@ü# y ÿí Yí Nyá P< Rãñ
GãUR XãR@üJyą[UáQą[a xŠãRb< Zą
GãUí RNyá Są[Ráb< Zá S Yïwj ÿï Fÿã@ü[Yá< Zá
GãUR XãRb] í UÜÿFyí Oï @ü* ãBï Z Yá< Zą[Yků
Yã@ü@üAR< íbï[í Yí Nyá P< Rãñ

ভাদ্র মাস
অমিত মাহাত

সর্বশেষ এই মেয়েটি যখন জন্মায় তখন ভাদ্রমাস। বাবা চাননি মেয়ে হোক। বাবার বরাবরের রাজসুলভ মেজাজ। কেবল মা-ই নিরুপায়। মেয়ে জন্মের আগে ও পরে।

বাবা চাইতেন রাজ। বুঝতেন ক্ষমতা। কর্তৃত্বে সে কারণে মেয়ের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ঘর হয়ে গিয়েছিল কোনঠাসা। বাবার শেষতম সম্বল ঔরস। যা কিনা বছর ভর রাজপুত্রের পিতা হবার বাসনায় খরচের খাতায়। এ মেয়ে তাই বাবার সবটুকু কেড়ে নিয়েছিল। বীর্য। রাজসুলভ মেজাজ। ক্ষমতা। আধিপত্য সব।

বাবার মুখ তখন গ্রহণ লাগা পৃথিবী। কী কুক্ষণে মা বলে উঠেছিল - আর না এবার ঘোড়া থামাও।

আজ মেয়েটি উনিশের কোঠায়। বি.এ. প্রথম বর্ষ। বাবা শব্দটি উচ্চারণ করত না মেয়ে। বাবাও মেয়ের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে শুরু করেছেন। এতগুলো মেয়ের ভরণপোষণ এবং সাংসারিক চাপে যারপরনাই বাবা বুড়িয়ে গেলেন। এখন যেন ফুরিয়ে যাওয়া। বহু কষ্টে মেয়েদের একের পর এক বিয়ে দিয়েছেন। তাতে খুইয়েছেন ধানী জমিন। এখন বাবার নিজের ক্ষয়। এ মেয়েও উপযুক্ত হয়ে উঠেছে বিয়ের। এর মধ্যে ...

অঘটন একটা ঘটল ঠিক। বিপদের এত কাছে থেকেও তার আঁচ যেন শীতের রোদের মতো। তাই পিঠ ফিরিয়ে থাকা।

মা টের পেয়েছিল। মেয়ে মাংসল হয়ে উঠেছে। শরীরে পিচ্ছিল মোমের পেলব যৌবন। চলতে ফিরতে চোখে লাগে। নেশা ধরায়।

রোজকার মতো বাবা সেদিনও বেরিয়ে গিয়েছিল। রাত পাহারায়। পরদিন ওভার ডিউটি। বাবার ঘুমহীন চোখে একটি প্রশ্ন উঠছিল এ বাড়ির দৈন্যতা। মেয়ে বাবার চোখাচুখি হতনা তেমন যদিও। তবুও দৃষ্টি তো এড়ায় না। কোটরে বসা গেঁড়ি গুগলির মতো চোখে বেরিয়ে আসতে চাইত বিরক্তি। বাবা কেন নরম যে গলায় ডাকেনি।

কেন বলেনি আয় বোস।

বোস আমার পাশটিতে।

তাই মেয়ের এত অভিমান। পাহাড় প্রমাণ মা টের পেয়েছিল। চোখের কোণা ছলকে ওঠে। অশ্রু দুগাল বেয়ে নদীর ধারা। ভাদ্রমাস।

আক্রান্ত পরিবেশ, বিপন্ন মানুষ

গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুটো প্রশ্ন এইভাবে করা যেতে পারে, পরিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্ক কী ? দ্বিতীয় প্রশ্ন, পরিবেশের সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ক ?

আমরা জানি এই দুটোর এক দু কথায় উত্তর দেওয়া অসম্ভব। তবে আমাদের যদি প্রশ্ন করা যায় যে পৃথিবীর সমস্ত দূষণের জন্য দায়ী কোন প্রানী ?

এই প্রশ্নের এক কথায় একটিই মাত্র উত্তর মানুষ। যারা এই পৃথিবীর একমাত্র সভ্য এবং উন্নত প্রজাতির প্রানী। যারা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে কেবলই উন্নত থেকে উন্নততর হয়েছে নিজের গ্রহ ছেড়ে পাড়ী দিতে পেরেছে অন্য গ্রহে। অঙ্ক কষে মেপে নিয়েছ তার অন্য গ্রহগুলির দূরত্ব এমন কি আলোর গতিবেগ পর্যন্ত। মানুষ প্রতিদিনই নিজেরই চেষ্টায় আয়ত্ব করেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দুরুহতম তত্ত্বগুলো। তাহলে কি আমরা জ্ঞান এবং বিজ্ঞানকেই শত্রু প্রতিপন্ন করে তার অধ্যয়ন, চর্চা ও গবেষণাকেই বাতিলের খাতায় ফেলে দেব ?

সমস্যা মূলত কোথায় ? এই আলোচনায় অবশ্যই আসব। তবে এই আলোচনায় আসার আগে মানব সমাজের ও সভ্যতার বিবর্তনের বিষয়টিও প্রাসঙ্গিক। আদিম মানুষ যেদিন প্রথম আগুন জ্বালাতে শিখল তখন থেকেই পরিবর্তনের সূচনা। এবং এই পরিবর্তন দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের। একটি সমাজের মধ্যে জন্ম নিয়ছে অন্য আর একটি সমাজের ভ্রুণ। সামাজিক বিবর্তনটা ঘটেছে হাজার হাজার বছর ধরে। বলা প্রয়োজন বিবর্তনের ধারায় প্রবাহিত একটি সমাজের গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া পরবর্তী সমাজ ছিল অবশ্যই উন্নত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লব এবং তার পরবর্তী সামাজিক পরিবর্তন উৎপাদন ও উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই বিষয়ে অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে এই বিকাশ কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে একসঙ্গে আসেনি। এই বিকাশ ঘটেছিল ইউরোপের সুনির্দিষ্ট একটি স্থান জুড়ে। এই শিল্প বিপ্লব জন্ম দিয়েছিল নতুন একটি শ্রেনী। একই সঙ্গে জন্ম নিল নতুন রাজনীতি, দর্শন, সংস্কৃতির। পরিবেশগত সমস্যার সূত্রপাত ঠিক এই সময় থেকেই। পুঁজিবাদ যত বিকশিত হয়েছে মুনাফার লোভ যত বেশি বেড়েছে, পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়েছে। এই সঙ্গে সমানুপাতিক হারে বেড়েছে পরিবেশগত দূষণ ও বিপর্যয়। ভুলে গেলে চলবে না রাজনীতি, অর্থনীতির ঘনীভূত রূপ। স্বাভাবিক ভাবেই পরিবেশগত আলোচনার প্রসঙ্গে এই দুটো বিষয়ই অনিবার্যভাবে প্রাসঙ্গিক। কথা প্রসঙ্গে মনে পড়েছে ১৯৮৪ এর ২রা ডিসেম্বরের মধ্যরাত্রির ইউনিয়ন কারবাইট কারখানার শিল্প দুর্ঘটনার কথা। তবে একে শিল্পগণহত্যা (ইন্ডাস্ট্রিয়াল জেনোসাইড) বলাই সমীচীন। এটিকে গণহত্যাই বলব কারণ ঘটনাটি একেবারেই আচমকা ঘটে যাওয়ার কোন ঘটনা ছিল না। ১৯৮১ সালের ২৫শে

ডিসেম্বর এই কারখানায় বিষাক্ত ফসজিন গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে একজন শ্রমিক মারা যান এবং অসুস্থ হন অনেক শ্রমিক। এর পরের বছর ১৯৮২ সালের মে মাসে এই কারখানার আমেরিকান এক্সপার্টরা ভূপালে কারখানা পরিদর্শনে এসে ৬১ রকমের ত্রুটি নথিভুক্ত করেন। ১৯৮২ সাল থেকে সাংবাদিক রাজকুমার কেশোয়ারী সংবাদপত্রে বহু নিবন্ধ লিখে সবাইকে সতর্কও করেছিলেন। এতো কিছুর পরেও ইউনিয়ন কার্বাইট কোনও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়নি। উপরন্তু খরচ বাঁচানোর জন্য ৩৩৫ জন কর্মীকে ছাঁটাইকরা হয়। সুরক্ষার যন্ত্রগুলিকে বন্ধ রেখে বিদ্যুৎ খরচ বাঁচানোর ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৮৪ সালের মধ্যরাত্রি দুর্ঘটনায় ৩৭০ টনেরও বেশি মিথাইল আইসো সায়ানেট গ্যাস লিক করে ভোপালের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত হন ৩৬টি ওয়ার্ডের ৫লক্ষ ৬০ হাজার মানুষ। মারা যান ৩৭৮৭ জন — এটি সরকারী হিসেব। বেসরকারী মতে প্রাথমিকভাবে মৃতের সংখ্যা ১০০০০ এর কাছাকাছি। আর বেঁচেছিলেন ? সে কষ্ট যন্ত্রণাকে ভাষায় ব্যক্ত করা যাবে না। মৃত্যুমিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে। আর যারা বেঁচে আছেন তাঁদের শরীরে মারণ রাসায়নিকের ক্রিয়া ছড়িয়ে গেছে ক্রোমোজমে। জন্ম নিচ্ছে বিকলাঙ্গ শিশু যাদের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নেই শারীরিকভাবে দুর্বল।

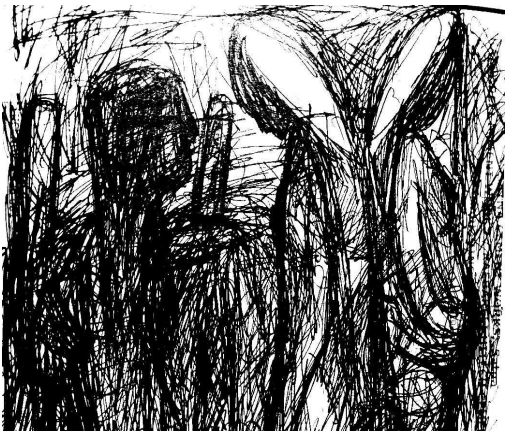

আজকাল সরকারীভাবে পেট্রোরসায়ন শিল্পের উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সাম্প্রতিক অতীতে নন্দীগ্রামে সালিম গোষ্ঠীর কেমিক্যাল হাবকে কেন্দ্র করে সেখানকার অধিবাসীদের দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের ঘটনা আজ ইতিহাস। আপনারা জানেন কি এই ইউনিয়ন ক্লোরাইডকে ? আমেরিকার কুখ্যাত ভাও কেমিক্যালস্। যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গণ বিধ্বংসী রাসায়নিক মারণাস্ত্র বানাত। তৈরি হয়ে আছে দুঁপো মিৎ সুবিশি, এমনকি ভারতীয় কর্পোরেট কোম্পানী টাটা, রিলায়েন্স ইত্যাদি। এখন তো যুদ্ধ নেই তাও পেট্রোরসায়নের এতো রমরমা কেন ?

আসলে এরা এখন ভোল পাল্টে নেমে পড়েছে কৃষিক্ষেত্রে। চাষের কাজে কীটনাশক হিসেবে হরেক নামে বাজারে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তার পেছনে রয়েছে এই সমস্ত পেট্রোরসায়ন শিল্পগুলি। আজকের কৃষি উৎপাদনে, বীজ, সার এবং বীজের প্রভাব এবং আগ্রাসন এবং এর পরিমান আজ আমাদের এই আলোচনায় আমরা উপস্থাপিত করব। তবে তার আগে আরও কিছু দূষণ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য হিসাবে উপস্থাপিত না করলে আমাদের বক্তব্য

প্রাণজল হবে না। জিডিপি অর্থাৎ Gross Domestic Product এর সঙ্গেও দূষণের বাড়া-কমার বিষয়টিও প্রাসঙ্গিক।

আমরা যদি একটু তলিয়ে দেখি তাহলে আমরা দেখব পুঁজি মুনাফার লোভে যত বেশি আগ্রাসী হচ্ছে দূষণও তত বাড়ছে। কেউ কেউ বলে থাকেন বিজ্ঞানের অগ্রগতিই দূষণের মূল কারণ। কিন্তু তা নয়। তাহলে তো বলতেই হয় আদিম মানুষ যেদিন আগুন জ্বালাতে শিখেছিল সমস্যার সূত্রপাত সেদিন থেকেই। বিষয়টিকে এইভাবে সরলীকৃত করলে মূল সমস্যাকে বুঝতে এবং তার সমাধান কখনোই করতে পারব না। দূষণের সমস্যা আজ আন্তর্জাতিক। সমস্ত পৃথিবী পুড়ছে। মেরু প্রদেশের বরফ একটু একটু করে গলছে যার ফলে সমুদ্রের জলস্তর ক্রমশ বাড়ছে। এর ভয়াবহ পরিণাম কী ঘটতে পারে সেই আশঙ্কার কথা বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীরা বারবার বলে আমাদের সতর্ক করছেন। হিমালয়ের হিমবাহ শুরু করে দিয়েছে গলতে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে, বাড়ছে কার্বন ঘনত্ব। দূষণজনিত কারণে শুধু ভারতেই মারা যান বছরে তিন হাজারেরও বেশি মানুষ।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরেই শান্তির পথ খুঁজতে তৈরি হয়েছিল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, পরে যা রাষ্ট্রপুঞ্জ। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বেড়ে ওঠা ভোগবাদ বাড়িয়ে তুলেছিল শক্তির অপরিমিত ব্যবহারের ফলে বিঘ্নিত প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে ঠিক রাখার তাগিদে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা বসে সুইডেনের স্টকহোমে। সময়টা ছিল ১৯৭২ সাল। সেখানেই প্রথম পরিবেশের স্বার্থে কিছু নীতি ঘোষিত হয় যা Stockholm Declaration নামে পরিচিত। মোট ২৬টি নীতি Stockholm Declaration এ ঘোষিত হয়েছিল।

বহুজাতিক পুঁজি ও দেশীয় বৃহৎ কর্পোরেট পুঁজির সীমাহীন লোভে বিপর্যস্ত পৃথিবীর উন্নতশীল, উন্নতকামী ও দরিদ্র দেশগুলি। আমাদের দেশও তাদের ব্যতিক্রম নয়। ১৯৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তরের পরবর্তী সময়ে ভারত সরকার যে নদী পরিকল্পনা নিয়েছিল তা ভারতের দরিদ্র কৃষিজীবি মানুষের কোনও কাজে আসেনি। এই বাঁধ পরিকল্পনায় ধ্বংস হয়েছিল হাজার হাজার একর বনভূমি। তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এই সব বড় বাঁধগুলিকে বলেছিলেন ভারতের মন্দির। পরে অবশ্য তাঁর এই সব ভুল ভেঙে ছিল। গান্ধিজী কোনদিনই বড় বাঁধ পরিকল্পনার পক্ষে ছিলেন না। নদী বাঁধ পরিকল্পনায় যে হাজার হাজার একর বনভূমিই লুপ্ত হয়েছে তা নয়, হাজার একর কৃষি জমি তলিয়ে গেছে জলের তলায়, উদ্বাস্তু হয়েছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ, যার অধিকাংশই হলেন আদিবাসী তথা মূল নিবাসী।

পরিবেশকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমটি হল অজৈব ও অন্যটি হল জৈব। অজৈব পরিবেশের রয়েছে তিনটি ভাগ। কঠিন তরল ও গ্যাসীয়। কঠিনের মধ্যে রয়েছে মাটি, শিলামন্ডল। তরলের মধ্যে রয়েছে জল। এর মধ্যে নদী, খাল, বিল এমন কি

বৃষ্টিপাতকেও ধরা হয়। জৈব পরিবেশের মধ্যে দুটি প্রধান উপাদান হল উদ্ভিদ ও প্রাণী। এগুলি পরিবেশের সজীব উপাদান বা Biotic Component। এই জৈব পরিবেশের সদস্য মানুষও। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন সমগ্র জীব মন্ডলী তাদের বেঁচে থাকার জন্য নিজস্ব গোষ্ঠীমন্ডলী তৈরি করেছে। মানুষও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে মানুষের ক্ষেত্রে বিষয়টি আর একটু অন্যরকম, তাকে ঘিরে আছে শারীরিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক একটি বৃত্ত।

কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের সব কিছুই গ্রহণ করে। শিক্ষা জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বহু সম্পদ তৈরি করে। তবে এর মধ্যে যে কথাটি এখনও পর্যন্ত বলা হয়ে ওঠেনি তা সৌরশক্তি। যেটি না থাকলে পৃথিবীতে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ কারও অস্তিত্ব থাকবে না।

....ক্রমশঃ

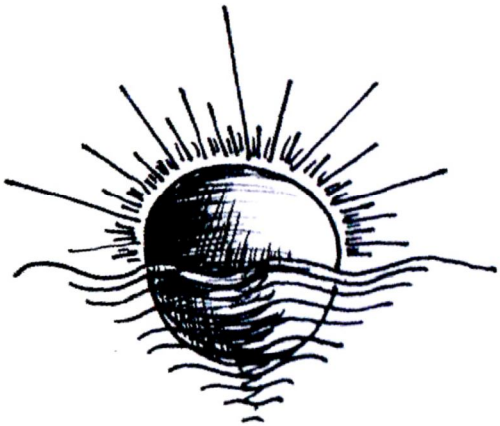

আমরা কতটা আধুনিক

স্মরণ রায়

বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে জন্মগ্রহণ ও বেড়ে ওঠা, একবিংশ শতাব্দীর যুবক এম.এ. ডিগ্রিতে মোটামুটি ভাল রেজাল্ট (৬০% এর বেশি) শুভদীপের। প্রথম শ্রেণীতে (৭০%) বি.এড্ ডিগ্রি অর্জন করেছেন তিনি।

জগৎ জুড়ে ''আধুনিক'' শব্দটির ব্যাপক বিস্তার, কিন্তু মাষ্টার ডিগ্রিধারী শুভদীপ ''আধুনিক'' শব্দটির গোলক ধাঁধাঁ থেকে কোন উত্তর খুঁজে পায় না। এই শব্দটি গোলক ধাঁধাঁর মতো পাক খেতে থাকে তার মস্তিষ্কে। এই 'আধুনিক' শব্দটির প্রকৃত অর্থ কি ? এটাই তার প্রশ্ন, আধুনিক বলতে কি বোঝায় ? তাই নিয়ে তার মনের উতলতা। আধুনিক শব্দের সঠিক অর্থ তার বোধগম্য হয় না কিছুতেই। আধুনিকতা প্রকাশ পায় কিভাবে — পোষাকে না রুচিতে ? শিক্ষার ক্ষেত্রে, উচ্চশিক্ষা শংসাপত্রে না কি শিক্ষিত চিন্তা শক্তিতে ? অর্থ যশের আভিজাত্যে নাকি মানুষের মনুষ্যত্বে ? এই ধরনের হাজারো প্রশ্ন তার মনের ভিতর সবসময় আন্দোলিত হতে থাকে।
বহুদিন ধরে সে মনে মনে খুঁজে বেড়ায় এই শব্দটির (আধুনিক) প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা।।

বন্ধুদের আড্ডায়, সমাজের প্রভাবশালী ও তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে শব্দটির অর্থ খোঁজার চেষ্টা করে। কিন্তু জট আর খোলে না বরং জট আরও জটিলভাবে পাকিয়ে যায়, কারণ সামাজিক উপাদানগুলি এত ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত যে একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আরও অনেক অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় তাকে। তার পিছনে একটি বড় কারণ - সে বড়োই স্পর্শকাতর, সামাজিক ভেদাভেদ তাকে বড়ো বেদনা দেয়। সমাজের স্বার্থান্বেষী মানুষ গুলোর ছড়ি ঘোরানো সহ্য করতে পারে না, মেনে নিতে খুবই কষ্ট হয়, আবার প্রতিবাদে গর্জে ওঠার শক্তি তার একার নেই। চারপাশের মানুষগুলো নিজস্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে এত

ব্যস্ত যে সামাজিক উন্নয়নের প্রশ্নে ঝাঁপিয়ে পড়ার লোক পায়না সে। অথবা লোকগুলো সঠিকভাবে অনুপ্রেরণা যোগাতে যে অক্ষম এটাও হতে পারে। যাইহোক না কেন এই গভীর সমস্যায় তাই সে বড়ো একা, বড়োই একা।

এভাবে চলতে থাকে তার এলোমেলো জীবন। জীবনে চলার পথে শুভদীপ এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি উত্তম মুখোপাধ্যায়, উচ্চ ডিগ্রিধারী শিক্ষিত, পত্নী শিক্ষিত, অপরূপ সুন্দরী, উচ্চ গৌরবর্ণা, মিষ্টি হাসি মুখে লেগে থাকে সর্বদা এবং মিষ্টভাষীও বটে। মধ্যবিত্ত সুখী পরিবার বলতে যা বোঝায় আর কি। প্রথমে উত্তমবাবুর পরিবারের প্রতি দীপের খুবই শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়, তাদের মধ্যে আধুনিকতার ছাপ দেখতে পায়। কিন্তু এভাবে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর শুভদীপ আবিষ্কার করে সে লোক চিনতে ভুল করেছে। তাদের চিন্তাধারা গোড়ামীপূর্ণ ও অনুদার। যেহেতু শিক্ষিত তাই প্রকাশ্যে সামাজিক ভেদাভেদ সম্পর্কে মুখোশধারী, কিন্তু মনে মনে গোড়া। শুভদীপ জানত উত্তমবাবুর পরিবার সুখী মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবার কিন্তু পরে অনুধাবন করলো যে উত্তমবাবু পদবি সূত্রে (মুখোপাধ্যায়) প্রচলিত মতানুসারে ব্রাহ্মণ, কিন্তু শুভ যে ব্রাহ্মণ ভেবেছিলেন তা তিনি নন। এখানে বলা আবশ্যক যে দীপ ব্রাহ্মণ জাতিকে অতি উচ্চ মনে করেন ও তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ পদবী অনুযায়ী নয় বরং ব্যক্তির শিক্ষা, চেতনা শক্তি, চিন্তাধারার প্রসারতা ও মনের উৎকর্ষতার উপর নির্ভর করে। এটা বলাবাহুল্য যে স্বার্থান্বেষী মানুষের ভিড়ে শুভদীপের এই চিন্তাশক্তি বিশাল প্রভাব ফেলবে এই আশা করিনা। তবে অন্ততঃ কিছু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে প্রভাবিত করবে এবং সমাজ গঠনে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করবে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। এ কথাটা জোর দিয়ে বলতে পারছি তার কারণ শুভদীপের সুবুদ্ধির সংস্পর্শে আশার সুযোগ আমার হয়েছে। ওর মতো বন্ধুর সংস্পর্শে এসে শুধুমাত্র আমার চিন্তাধারার আমুল পরিবর্তন হল তাই নয়, আমি নতুনভাবে ভাবতে শিখলাম। এমন অনেক কিছু পেলাম যা আগে জানতাম তো নয়ই বরং তার উল্টোটা ভাবতাম।

শুভদীপ আমার মায়ের খুব প্রিয় পাত্র। এবারে অনেকদিন বাদে সে এল আমাদের বাড়িতে। মায়ের হাতের লুচি ও আলুর দম ওর খুব প্রিয়। এসেই প্রিয় মাসিমার কাছে আবদার - 'মাসিমা আমার প্রিয় খাবারটা চাই'। যথারীতি লুচি, আলুর দমের ব্যবস্থা হল। সকল মানুষদের জন্য সেদিনের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করলাম - মা গরম গরম লুচি আর আলুর দম দিয়ে গেলেন। অনেক দিন বাদে দেখা হওয়া দুই বন্ধু আর গরম গরম ফুলকো লুচি ও আলুর দম সহযোগে আমাদের দুই বন্ধুর আড্ডাটা বেশ জমে উঠলো। খেলা-ধুলো থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন বোঝাপড়ার বিষয়ে আলোচনা চলছিল। আলোচনা বেশ জোরালো

হলো সামাজিকতা প্রসঙ্গে। সামাজিকতার একটা বিষয়ে আমার মনে একটা প্রশ্ন দীর্ঘদিন আন্দোলিত মনটাকে অস্থির করে তুলেছিল। শুভর সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনার সুযোগ নষ্ট না করে আমি একটা প্রশ্ন তুললাম। প্রশ্নটা–''আমাদের সমাজে শিক্ষার হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, উচ্চতর শিক্ষার হারও চোখে পড়ার মতো, তা সত্ত্বেও সমাজে এত ভেদাভেদ ও সংকীর্ণতা কেন ? ১০০ বা তারও বেশি বছর আগে রবিঠাকুর, স্বামীজিরা যে কথা উপলব্ধি করে আমাদের যে পথ বা ভাবধারা অনুসরণ করতে বলেছেন, এতগুলো বছর পরেও তা গ্রহণ করার মতো মানসিক শক্তি বা শুভবুদ্ধি আমাদের হয়নি কেন ? দু-এক মিনিট কোন আওয়াজ হলো না, দুজনেই চুপ। বুঝলাম প্রশ্নটার ওয়েট আছে। ভালো প্রশ্ন করেছি। গলা কাখানিতে নিশ্চুপতা ভঙ্গ হল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো বন্ধু! এই জন্যই তো আমরা পিছিয়ে পড়েছি, কোন কিছু শেখার ব্যাপারে ধৈর্য্য দেখাতে আমরা উদাসীন। তবে আক্ষেপ প্রকাশ পাচ্ছিল কন্ঠস্বরে। কিন্তু তার চোখ মুখ দেখে মনে হলো, এতদিনে শুভদীপ হয়তো একটা মনের মতো প্রশ্ন পেল। যার উত্তর দেওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করে আছে বলে উঠলো শোন বন্ধু এ প্রশ্ন শুধুমাত্র তোমার বা আমার নয়, এ প্রশ্ন এই সমাজের, এই সমাজের প্রতিটি সচেতন মানুষের, যারা উন্নত এক দেশ গড়তে চায়, চায় উন্নত সমাজ, দেশ ও দশের মঙ্গল চায় যারা এ প্রশ্ন তাদের সকলের। এর উত্তর আমি অনেক খোঁজার চেষ্টা করি সমাজের ও দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে। কিন্তু সঠিক কারণটা যে ঠিক কোথায় লুকিয়ে আছে! কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর আবার শুরু করলেন আমার প্রিয় দীপবাবু - ''আসলে আমার কি মনে হয়, জানো বন্ধু'' - কোন কিছু শেখার ক্ষেত্রে প্রথমে দরকার 'অনুধাবন' শক্তি যা মানসিক ভিত মজবুত করে। প্রকৃত শিক্ষা চেতনা আনে, আর চেতনা শক্তিই মানুষকে মানুষ্য ভাবতে শেখায়। যার মাধ্যমে সমাজের ভেদাভেদ দূর হবে। রবিঠাকুরের ভাষায় - ''শিক্ষা গ্রহণের প্রাথমিক পাঠ হল মানুষ্যকে মানুষ ভাবার শিক্ষা।'' তবে দুঃখের ব্যাপার কি জানো ভাইয়া আমরা বেশির ভাগ মানুষ উচ্চ শিক্ষা শংসাপত্র অর্জন করতে যতটা আগ্রহী প্রকৃত শিক্ষাগ্রহণে ঠিক ততটা নই। বাস্তবিক পক্ষে শিক্ষাগ্রহণের প্রাথমিক পাঠটুকু (রবিঠাকুরের মতানুযায়ী) কতজন উপলব্ধি করতে পেরেছি বলোতো। আর সেটাই যদি না পারি অর্থাৎ শিক্ষাগ্রহণের প্রাথমিক পাঠটুকু অর্জনে ব্যর্থ হয়ে আমরা শুধুমাত্র শংসাপত্রের জোরে নিজেদের শিক্ষিত বলে গর্ববোধ করতে পারি কি ? আমার মনে হয় নিষ্ঠা ও সততার প্রতি সুবিচার করলে তা পারিনা। তাহলে প্রশ্ন হলো আমরা কতটা শিক্ষিত ? আমাদের চেতনা শক্তির বিকাশ কতটা ? আমাদের মনের গভীরতা বা প্রসারতা বা কতটা ? এরকম অসংখ্য প্রশ্নবান ধেয়ে আসতে পারে আমাদের দিকে। বলা যায়, এক্ষেত্রে 'আধুনিক' মানুষ হওয়ার বিবেচ্য শর্তগুলোর অধিকাংশই পূরণে আমরা অপারগ, অথচ তা স্বীকার করতেও আমাদের দ্বিধা। এইদিক

থেকে বিচার করলে আমরা সত্য স্বীকারে দ্বিধাগ্রস্ত । এটা মিথ্যাচারিতা বা কাপুরুষতাও বলতে পারো। এইগুলো যাদের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য তারা কিনা 'আধুনিক' ? তারা কিনা শিক্ষিত ? রাগে, অভিমানে দীপের চোখমুখ লাল হয়ে উঠলো। কণ্ঠস্বর গম্ভীর ও জোরালো হয়ে উঠেছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো। আমি বুঝলাম সমাজের এই সংকীর্ণতা ওর মনকে কতটা ব্যাথায় জর্জরিত করে রেখেছে। আবার বলতে শুরু করল দীপ - আসলে আমরা 'ধুয়া' গাইয়ে। 'ধুয়া গাইয়ে' শব্দটি হয়ত সকলের পরিচিত তাও বলে রাখি গ্রাম্য অঞ্চলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিশেষ করে ধর্মীয় অনুষ্ঠান গুলিতে একজন মূল গায়ক থাকেন, তিনি একটি গানের এক এক কলি পরিবেশন করেন এবং তাকে অনুসরন করতে অন্যরা অর্থাৎ 'ধুয়া গাইয়েরা' পুরো ছত্রটি বা কালিটি না গেয়ে শুধু মাত্র শেষ লাইনের কিছু অংশ গেয়ে ওঠেন। ধরুন মূল গায়ক গাইলো ''দশরথের রাখতে কথা রাম গেলেন বনবাসে।'' 'ধুয়া গাইয়েরা' গাইলেন রাম গেলেন বনবাসে।। এরকম 'ধুয়া গাইয়ে' হয়ে সভ্যতা সংস্কৃতির মূল ব্যাপারটা ভুলে আমরা অন্যকে শুধু অনুকরণ করতে চেষ্টা করি। অনুকরণে কোনো দোষ নেই যদি সেটা উপলব্ধি করে গ্রহন করা যায়। কিন্তু আমরা পুরো বিষয়টা অনুকরণ না করে 'ধুয়া গাইয়ের' মতো আংশিক অনুকরণ করি। ফলস্বরূপ আমরা বিকৃত রুচির পরিচয় দিয়ে থাকি। পোষাক ও খাদ্যের ব্যাপারেও আমরা অন্যকে বড্ড বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। কোন পোষাকে নিজরা স্বচ্ছন্দ বা কোন খাদ্য আমাদের পক্ষে সঠিক বা কোন খাদ্য খেতে আমরা অভ্যস্ত তার থেকেও আমাদের পোষাক ও খাদ্য গ্রহণে অন্যের কি প্রভাব হবে সেটাই বেশি বিবেচ্য হিসাবে দেখা যায়। নিজের মন বা রুচি নয় অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হতে আমাদের বেশি পছন্দ। প্রকৃতপক্ষে আমরা আধুনিক হওয়ার থেকে বরং আধুনিকতার মোড়কে আবদ্ধ হতে বেশি পছন্দ করি। এবার থামলো দীপ। শান্ত, ধীর, স্থির শুভ চোখ বন্ধ করে বসে আছে। আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মতো বিভোর হয়ে তার যে কথাগুলি এতক্ষণ ধরে শুনছিলাম তার রেশ বয়ে চলেছি। কানের মধ্যে শব্দের সেই অনুরনন বেজে চলছে। সেও আমার মতো শ্রোতা পেয়ে তার মনের ভিতরে জমে থাকা ক্ষোভ, দুঃখ ব্যক্ত করতে পেরে নিজেকে অনেকটা হালকা করতে পারলো। চুপচাপ, থমথমে নিস্তব্ধ পরিবেশটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না।

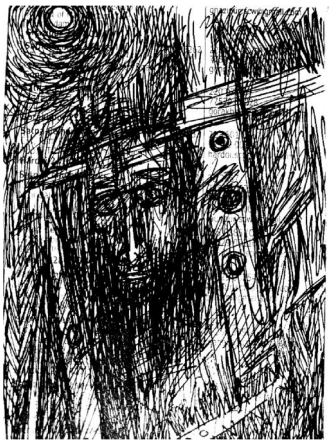

হঠাৎ চোখ খুললো শুভ। আবার বলতে শুরু করল - 'আসলে আমরা কেউই স্বার্থপর

নই। সমাজের উন্নতির জন্য, নিজের উন্নতির জন্য, দশের উন্নতির জন্য আমাদের আরও বেশি স্বার্থপর হয়ে ওঠা দরকার। শুনে তো আমি অবাক! বলে কি ? ভাবলাম আমরা স্বার্থপর বলে আক্ষেপ করবে। সমাজের উন্নতির ক্ষেত্রে আমাদের এই স্বার্থপরতা অন্তরায় সৃষ্টি করছে -একথা ব্যাখ্যা সহকারে আমাকে বোঝাবে। স্বার্থপরতায় দেশটা ছেয়ে গেছে বলবে। কিন্তু তার উল্টোটা ঘটায় আমি শুধু অবাক হলাম তাই নয়, স্তম্ভিত হলাম কি বলতে চাইছে ভেবে। বুদ্ধিরা সব গোল পাকিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য অস্থির অবস্থাটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না, দীপ বলে চলল -আমাদের আরও বেশি নিজের কথা ভাবতে হবে, হয়ে উঠতে হবে স্বার্থপর। কারণ আমদের আরও বেশি নিজের কথা ভাবতে হবে, হয়ে উঠতে হবে স্বার্থপর। কারণ আমরা বেশির ভাগই কিন্তু অন্যের জন্য বাঁচি। অন্যের কি ভালো লাগবে, লোকে কি মনে করবে, অন্যের কাছে নিজেকে জাহির করার তাগিদ আমাদের বড় বেশি। অন্যকে এত গুরুত্ব দিতে গিয়ে আমরা নিজের গুরুত্ব ভুলে যাই। আমাকে, আমার কিভাবে ভালো লাগবে, কোন অন্যায় করলে আমি নিজের কাছে কতটা ছোট হবো সেটা বিবেচ্য নয়। আমার অবাক চোখের চাউনি দেখে সে বলে উঠলো বুঝলে না তো, তোমাকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি - দেখো বন্ধু, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়মঠ প্রভৃতি স্থান গুলিতে বা আরো যে সকল ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থানে আমরা সকলে যাই, এ সকল স্থানে গেলে একটি নোটিশবোর্ড তোমাকে অবগত করায় যে সেখানে মোবাইল ফোন বন্ধ রাখবে হবে এবং কোনরকম ফোটোগ্রাফি নিষেধ। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখবে সেখানে প্রচুর লোক ফোনে কথা বলছে, ফটো তুলছে। যাদের তুমি সম্ভ্রান্ত, আধুনিক মনে করে ভুল করবে। কিন্তু এমন কেনো হবে ? ভিতরে ঢোকার সময় প্রহরী তোমাকে বলে দিলো নিষিদ্ধ নির্দেশিকা, নোটিশবোর্ড তোমাকে অবগত করালো তারপরও তুমি, আমি নিষিদ্ধ কাজটি কেন করছি জানো ? কারণ ভিতরে কোন প্রহরী নেই যে কথা বলার জন্য বা ফটো/ছবি তোলার জন্য তোমাকে অপদস্থ করবে বা আর্থিক জরিমানা করবে। তাই যে সকল স্থানগুলিতে এমন প্রহরী বেস্টনী আছে যেখানে এগুলো ঘটেনা। এখানে আমার প্রশ্ন প্রহরী বাধ্য করলে তবে আমরা শুনবো ? অথচ ভেবে দেখো আমাদের মনের ভিতরে যদি একটা প্রহরী থাকতো তবে একটিমাত্র নোটিশই যথেষ্ট ছিল আমাদের কথা বলতে বা ছবি তুলতে বাধা প্রদান করার জন্য বা ঐ সকল নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখতে। তোমার মন যদি তোমার শাস্তি বিধান করতে পারে তবে বাইরে থেকে কোন কাজে কাউকে বাধ্য করতে হবে না। সেক্ষেত্রে কঠিন কাজগুলো হবে সহজতর। তার জন্যই বলছি আমাদের নিজেদের প্রতি আরও যত্নবান হতে হবে গুরুত্ব দিতে হবে নিজেকে। স্বার্থরক্ষা দরকার, হতে হবে স্বার্থপর। নিজের তুলনা করতে হবে নিজের সঙ্গে, নিজের কাজের পুরস্কার বা শাস্তি বিধান যদি নিজেই করতে পারি, নিজের কাজের সমালোচনা

নিজেই করতে হবে এটা মনে করতে পারলে প্রতিটি মানুষ হয়ে উঠবে উন্নততর, তখন সমাজের অগ্রগতি কেউ রুখতে পারবেনা। আমরা উন্নত থেকে উন্নততর হব। হয়ে উঠব আধুনিক! আধুনিক!! (দীর্ঘনিশ্বাস)

শুভদীপের দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকলাম। স্বার্থপর শব্দটা সম্বন্ধে আমার ধারণা পাল্টে গেল। প্রচলিত অর্থে 'স্বার্থপর' শব্দটিতে আমরা যা বুঝি শুভদীপ তার ঠিক বিপরীত মেরুতে শব্দটিকে ব্যবহার করলো। তার ব্যাখ্যা থেকে এই শব্দটির ব্যবহার কার ব্যাপারে আমি অন্ততঃ কোন ভুল পাচ্ছিনা। আবার 'স্বার্থপর' শব্দের প্রচলিত অর্থটিও নিশ্চয়ই ভুল নয়, আবার বিপরীত অর্থও দেখলাম। আচ্ছন্ন হয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। বিভোর হয়ে ভাবলাম জ্ঞানে প্রসারতা ও প্রগাঢ়তা কি কোন নির্দিষ্ট গন্ডীতে আবদ্ধ না থেকে নিয়ে যেতে পারে অসীমে, এটাই কি আধুনিকতা ? শুভদীপই কি আধুনিকতার বাহক ? যাকে আমরা এতদিন পুরানোপন্থী, রক্ষণশীল, আমাদের তথাকথিত আধুনিক জগতে খাপ খাওয়াতে না পারা গেঁয়ো ছেলে বলে ভাবতাম, সেই ছেলেটার কাছ থেকেই আধুনিকতার আসল অর্থটা আমি বুঝতে পারলাম আজ। সেই সাধারণ ছেলেটাই আজ আমার চোখে অসাধারণ, উন্নতমনের মানুষ। আর আমরা যারা নিজেদের নিয়ে বড়াই করি তারা কত যোজন পিছিয়ে পড়া মানুষ। আমরা পড়ে আছি ঠুনকো জিনিসগুলো নিয়ে। আসলে আমাদের বাহ্যিক ব্যাপারগুলো নিয়ে যতটা যত্নশীল মনের ব্যাপারে হয়তো ততটাই নই। কিন্তু আমাদের মনের ব্যাপারেই বেশি যত্নবান হওয়া উচিত ভবিষ্যত প্রজন্মের কথা ভেবে, এই আমার উপলব্ধি।

আমাদের ভুলগুলো শুধরে নিয়ে ভবিষ্যতের শিশুপ্রজন্মের জন্য সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্বের সুন্দর পরিবেশ তৈরী আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। শিশুদের শিক্ষার প্রতিলিপি গঠনের সূচক মনে। ওরা খুব নিখুঁতভাবে আমাদের অনুকরণ করতে পারে। তাই আমাদের চিন্তাভাবনা, চালচলন তাদের মধ্যে প্রতিশ্রুত হয় নিখুঁতভাবে। এজন্যই সুন্দর ভবিষ্যত প্রজন্ম গঠনের জন্য আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থগুলো ত্যাগ করে বৃহৎ স্বার্থের জন্য মনের উন্নতি বিধান করতে হবে, দূর করতে হবে গোড়ামী ও সংকীর্ণতা যুক্ত ভাবনা চিন্তা, তবেই শুভবুদ্ধির আলোকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানসিক ভীত তৈরি হবে আধুনিকতার কাঠামোয়।।

টান
বিকাশ রায়

সোনাই আজ খুব খুশি। দিদির বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল। আগামী মাসের শেষের দিকে। দিদির বিয়েতে খুব মজা হবে। বেশ কয়েকদিন আনন্দে কেটে যাবে। বাড়িতে অনেক আত্মীয় স্বজন আসবে, বন্ধু বান্ধব আসবে। সারাদিন হই হই হবে। সোনাইয়ের আনন্দ আর ধরে না। দিন ঠিকের কথা শুনেই ভাবতে শুরু করে কাকে কাকে দিদির বিয়েতে ডাকবে, মামার ছেলে আসলে তাকে নিয়ে কোথায় কোথায় যাবে। পিসতুতো দাদা গ্রামে এলে বুনো হাতি দেখতে চাইবে। সেটাও মনে মনে ঠিক করে নেয়, লম্বুকাকাকে বললে, সে ঠিক হাতি দেখানোর ব্যবস্থা করে দেবে। লম্বু হাতি তাড়াতে যায়, ফিরে এসে সোনাইকে হাতি তাড়ানোর গল্প বলে। সোনাইয়ের সে গল্প শুনতে ভীষণ ভালো লাগে।

একবারই খুব খারাপ লেগেছিল। যেদিন লম্বু কাকা এসে বলল 'এতদিন পর বাঘটাকে মেরে দিল।' সোনাই সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করছিল 'কোন বাঘটাকে মেরে দিল ?' 'আমাদের জঙ্গলে একমাস ধরে একটা বাঘ ঘাপটি মেরে বসেছিল। ফরেস্ট বাবুরা বাঘটাকে ধরবার কতরকম চেষ্টা করল কিন্তু ধরতে পারেনি।' সোনাই আবার জিজ্ঞাসা করল 'যে বাঘটাকে টিভির খবরে দেখাচ্ছিল ?' 'হঁ গো বাবু সেই বাঘটাকেই আজ বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে দিয়েছে।' বাঘ মারা যাওয়ার খবরটা শুনে সোনাই ভীষণ দুঃখ পায়। এতদিন এই গ্রামের জঙ্গলে কোন বাঘ ছিল না, হাতি ছিল, আরও অনেক প্রকার জন্তুর দেখা পাওয়া যেত এই জঙ্গলে। গ্রামের মানুষ নির্বিচারে গাছ কাটার জন্য হাতির পাল মাঝে মাঝেই গ্রামের ভিতরে ঢুকে পড়ত, বেশ কিছু মাটির ঘরও ভেঙে দিত। মাঠের ফসল নষ্ট করত।

তখন সোনাই দুঃখ পায়নি। তারপর একদিন জানা গেল জঙ্গলে বাঘ মামা এসেছে। খবরটা সোনাইয়ের খুব ভালো লেগেছিল। এতদিন সবাইকে বাঘ দেখার জন্য শহরের চিড়িয়া খানায় যেতে হত। এখন আর বাঘ দেখার জন্য চিড়িয়া খানায় যেতে হবে না। জঙ্গলে বাঘ আসায় গ্রামের কেউ আর জঙ্গলে গাছ কাটতে যেতে পারত না। সেই জন্যই সোনাই চাইত বাঘ মামা জঙ্গলেই থাকুক।

এই কথাটা সোনাই তার বাবাকেও বলেছিল একদিন। ওর বাবা বাড়িতে নানা ধরনের গাছ লাগায়। সেই গাছ লাগানো দেখে সোনাই বলেছিল, বাবা তুমি এত গাছ লাগাও কেন,

চারিদিকটা জঙ্গলে ভরে যাচ্ছে। এখানেও যদি বাঘ চলে আসে, সোনাই এর বাবা সেদিন কোনও উত্তর দেয়নি উল্টে বলেছিল চল, কাল তোমার পিসির বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। পিসির বাড়ির নাম শুনে সোনাইয়ের মন আনন্দে ভরে উঠেছিল।পরের দিন সোনাই ওর বাবার সঙ্গে পিসির বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। বড় শহরের প্রাণ কেন্দ্রে ওর পিসির বাড়ি, রাস্তাও অনেকটা। বেশ কয়েকঘণ্টা বাস, ট্রেনে সফর করে বড় শহরে পৌঁছালো ওরা।

শহরের গাছপালা দেখে সোনাইয়ের মন খারাপ হয়ে গেল। তার উপর রাস্তা যেন হালকা ধোঁয়ায় ভর্তি। কিছুক্ষণের মধ্যে মাথার চুলগুলো তারের শক্ত মনে হল। সানাইয়ের প্রাণ ভরে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। তাই ওর বাবাকে জিজ্ঞাসা করল 'বাবা এখানে গাছের পাতাগুলো কালচে কেন, আর নিশ্বাস নিতেই এত কষ্ট হচ্ছে কেন ?'

'গাছের পাতায় কার্বন মনোক্সাইড জমা হয়েছে তাই কালচে দেখাচ্ছে। আর সারা শহর গাড়ীর কার্বন মনোক্সাইডে ভরে গেছে, সেই জন্যই তুমি প্রাণভরে শ্বাস নিতে পারছো না। তোমার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে'— সোনাইয়ের বাবা উত্তর দেয়, আরও বলে — 'তুমি আমায় কাল জিজ্ঞাসা করছিলে, কেন আমি গাছ লাগাই, আমি গাছ লাগাই প্রাণ ভরে শ্বাস নেওয়ার জন্য। আজ বুঝলে তো।'

'হ্যাঁ বাবা' বলেই সোনাই চুপ করে যায়।

কথাগুলো মনে পড়তেই সোনাই নিজের মনেই হেসে ওঠে। ঠিক সময় ওর জ্যাঠামশাইয়ের গলা শুনতে পায়। উনি বলেছিলেন লম্বু, সোনাঝুরি গাছটা কাটার ব্যবস্থা কর। ঐ গাছটা দিয়েই বিয়ের পালঙ্ক বানিয়ে নেবে। বেশিদিন আর সময় নেই হাতে।

'ঠিক আছে আমি আজই গাছ কাটার ব্যবস্থা করছি।' – কথাটি বলেই লম্বু কাকা উঠে দাঁড়ায়।

অমনি সোনাই দৌড়ে আসে, এসেই বলে 'না জ্যেঠু ঐ সোনাঝুরি গাছটা কেটো না।'

'সে কিরে, গাছটা না কাটলে পালঙ্ক হবে কি করে ?' সোনাইয়ের জ্যাঠামশাই বলেন।

না জ্যেঠু ঐ বড় গাছটা কেটে দিলে আমি প্রাণ ভরে শ্বাস নিতে পারবো না। প্লিজ জ্যেঠু, ঐ গাছটা কেটো না।'

বাড়ির বড়রা সোনাইয়ের কথা শুনে চুপ করে থাকে, কোন উত্তর দিতে পারে না। সোনাইয়ের বাবা ওর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

নতুন জামা
প্রদীপ কুমার মাহাত

ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকটা যে কখন থেমে গেছে হাট ফেরৎ ভূমিজ তা টেরও পায়নি। সাইকেলটা থেকে নেমে সবে বাড়ির উঠোনে পা রেখেছে - ছোট ছেলেটা বাড়ির ভেতর থেকেই বলে উঠল - বাবা নতুন জামা এনেছ ?

মুনিয়া ধমক দিয়ে উঠে, তোকে কতবার বলেছি 'মকর'টা আসুক, কথা কানে যায় না। এমন সময় মুন্ডা পাড়ার হরি মুড়ার কন্ঠে চিৎকারটা ভেসে এল - হাতির পাল নামেছে হে-এ-এ-এ, তিল ডাহি দিগে -এ-এ-এ। সেই সঙ্গে টিনভাঙ্গা ও চকোলেট বোমের আওয়াজ।

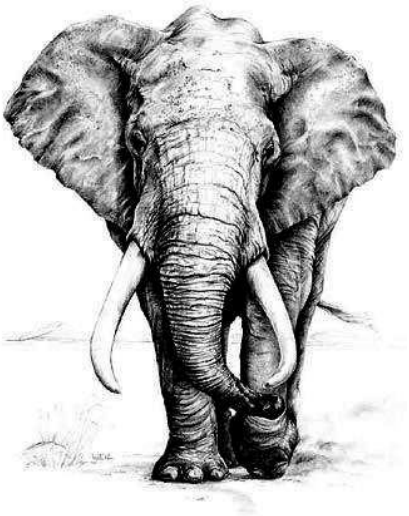

তিলডাহিতে সুধীরের দু-বিঘা জমিতে বাঁধাকপি আর বেগুন লাগানো আছে। হাতির পাল নামলে...

সুধীর তাড়াতাড়ি সাইকেলটা রেখে একটা চাদর ও টর্চ লাইট হাতে নিয়ে তিলডাহির দিকে পা বাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে মুনিয়া পেছন থেকে হাঁক দিল -'একলা কুথাও যাইতে হবেক নাই এই আঁধারে। আমি ঠাকুরকে সঁঞঝ্যা দেখায় দিছি - ঠাকুর নাই নষ্ট কইরবেক, গত বছর দেইখ্ল্যে নাই হামদের বাড়ি-ই-ত গেল - একটা কপিও ছুঁয়ে নাই।

মুনিয়ার কথাটায় কিছুটা ভরসা পায় সুধীর। উঠানে দাঁড়িয়ে যায়। মনটা ছট্পট্ করে ওঠে সুধীরের। আমন ধান যেটুকু ঘরে ওঠে তাতে সারা বছর ভাতটা চলে যায়, শীতের মরসুমে এই কপি-বেগুন বিক্রি করেই তার সংসারটা চলে, মকর পরবে বৃদ্ধা মা আর ছেলে মেয়ে, বৌ এর নতুন জামা কাপড় হয়।

ছোট ছেলেটা এক নাগাড়ে আওড়ে চলেছে - 'নয় এক্কে নয়, নয় দু-গুনে আঠারো, নয় তিনে সাতাশ।' প্রতি সন্ধ্যায় ছেলে মেয়ে দুটিকে সুধীর নিজেই পড়ায় - নামতা, ইংরেজী, ব্যাকরণ।

মাধ্যমিক পাশ সুধীর যা জানে তা উজাড় করে দেয় সন্তানদের মধ্যে। পড়া শেষ হলে শোনায়, মহাভারতের কাহিনী। রাতে খাওয়া শেষ হলে ছেলে মেয়েদের খোলা আকাশের নীচে এনে তারা গোণা চলে খেলাচ্ছলে। সুধীর বালিচুয়া হাইস্কুলের হাড়িরাম মাস্টার মশাইয়ের

কাছে শিখেছিল তারারা নাকি অবস্থান পরিবর্তন করে; সে স্বপ্ন দেখে তার ছেলে মেয়েরা বড় হয়ে বৈজ্ঞানিক হবে। আট বছরের মেয়েটা লক্ষ্মী, ক্লাস ফোরে পড়ে সে দেখিয়ে দেয় কোনটা ছায়াপথ, কোনটা সপ্তর্ষিমন্ডল। সে হিসাব জানে শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষের।

ক্রমে চিৎকার আর গোলমালটা তীব্রতর হতে থাকে এই বুড়িশোল গ্রামের নীচ পাড়ার দিক থেকে। মনটা চন্‌মন্‌ করে ওঠে সুধীরের। তারও মন চাইছে না এই রাত বিরেতে মাঠে ফসল আগলাতে যেতে। সামনেই মকর পরব। যদি হাতি ঠাকুর খেয়ে নেয় সব কিছু!

-না আর ভাবতে পারেনা বছর পঁয়ত্রিশের সুধীর সিং। সে তার বউয়ের মুখের দিকে তাকায়। খুব সুন্দরী লাগছে তাকে। লালপেড়ে তাঁত শাড়ি ও নারকেল তেল জবজবে চুলের মাঝখানে সীঁথি ভর্তি লাল সিঁদুর! সুধীরের শরীরে যেন উষ্ণপ্রস্রবন বইয়ে দিল।

-মাগো, ভাত খাব চ; তখন ঠান্ডা হয়েঁ যাবেক। মুনিয়া ছেলে মেয়েদের ভাত খাওয়াতে ঘরে গেল। গোলমালটা থেমে গেছে। সুধীর উঠানে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে হাতির অবস্থান বোঝার চেষ্টা করছিল, এমন সময় -

– সুধা খুড়া ব-অ-অ-অ। কপি বাড়ি-এ ঠাকুর নামে গেছে-এ-এ-এ। সুধীরের এক মুহুর্তে মনে ঝল্‌সে ওঠে মকর পরবের ছবিটা, ছেলেটার নতুন জামা কেনা হয়নি।

– নাঃ আর দেরী নয়, উঠোনে পড়ে থাকা বাঁশ লাঠিটার আগায় ছেঁড়া টায়ারটা কোনোরকমে জ্বেলে নিয়ে সাঁ করে ছুটে বেরিয়ে গেল। জ্বলন্ত টায়ারের আগুন দেখে হাতিটা ভয় পেয়ে এগিয়ে গেল অনেকটা কপি বাড়ি ছেড়ে। ততক্ষণে সবাই মিলে মশাল নিয়ে ঘিরে ফেলেছে কপি বাড়িটা।

– কিন্তু এ কী সবাই মশাল ছেড়ে পালাচ্ছে কেন ? তীরবিদ্ধ ষাঁড় হাতিটা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তাড়া করছে সবাইকে। যে যেদিকে পারছে ছুটছে। শুধু একা বাঁশের লাঠিতে জ্বলন্ত টায়ার হাতে কপি বাড়িতে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কিষাণ সুধীর সিং। শুঁড়ে তুলে শূন্যে ছুঁড়ে দিল হাতিটা জ্বলন্ত টায়ার সমেত সুধীর সিং কে।

বাঁশের লাঠিটা বুকে চেপে শুনতে পাচ্ছে ছেলেমেয়ের করুণ আবদার;

- বাবা আমাদের নতুন জামা কই ?

ভগবানের মার
জয় সান্যাল

সুন্দর বাবু এ পাড়ার একজন জনপ্রিয় ব্যক্তি, তবে একটা ব্যাপারে ওনার দুর্নাম আছে, উনি বড় কৃপণ, শোনা যায় আজ অব্দি কোন ভিখারীকে এমন কি কোন মন্দিরে-কোন দক্ষিণা পর্যন্ত দেননি। আর এক্ষেত্রে তাঁর অকাট্য যুক্তিও আছে।

তো এই সুন্দর বাবু প্রতিবেশীদের সাথে ৪-৫ দিনের জন্য পুরী ঘুরতে গেছেন, গত ৪দিন তিনি সমুদ্র দেখেই কাটিয়েছেন, আর বাকিরা কোনারক, বুদ্ধগয়া, নন্দন-কানন প্রভৃতি ঘুরেছেন, প্রচুর কেনাকাটা করেছেন। আজ রাত্রে ফেরার ট্রেন, তাই সকলে মিলে ঠিক করলেন আজ সকাল ১০ টায় তারা পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে যাবেন পূজো দিতে বা দর্শনের জন্য। সবাইকে অবাক করে সুন্দর বাবু বলে উঠলেন - আজ আমি আমার রেকর্ড ভাঙব এবং জগন্নাথ দেবকে দক্ষিণা দেব। আসলে বাকিরা কেউই জানেন না যে সুন্দর বাবুর কাছে বেশ কিছুদিন ধরে একটা ছেঁড়া চেটানো ১০ টাকার নোট আছে, যা নিয়ে উনি ভীষণ বিড়ম্বনায় পড়েছেন, অনেকবার অনেকভাবে চালানোর চেষ্টা করেও বিফল হয়েছেন।

মন্দিরে প্রচুর ভক্তের ভিড়, কোলাহল, ঘণ্টার ধ্বনী, শঙ্খ ধ্বনী... সে এক আলাদা পরিবেশ, ওই ভিড় ঠেলে সুন্দরবাবু এগিয়ে গেলেন ও পিছনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ওই ১০ টাকাটা বার করে সকলের সামনেই প্রণামী থালায় রাখলেন। এমন সময় পিছন থেকে এক মহিলা সুন্দরবাবুর পিঠে ঠেলা দিয়ে ডাকলেন, সুন্দর বাবু পিছনে ফিরে তাকালেন দেখলেন মহিলার হাতে দুই হাজার টাকার নোট সুন্দর বাবুকে ঈশারায় নিতে বলছেন। তাই সুন্দরবাবু নিলেন ও একইভাবে প্রণামী থালায় রাখলেন, এই সময় ওই মহিলা কি যেন বলছিলেন, কিন্তু ওই পরিবেশে কিছুই শোনা যাচ্ছিল না।

অনেক কষ্টে ওই ভিড় ঠেলে সুন্দর বাবু বেরিয়ে এসে মন্দিরের বাইরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ঘাম মুছতে মুছতে নিজের চালাকির জন্যে মনে মনে নিজের তারিফ করছিলেন।

সেই সাথে ভাবছিলেন যে ঐ ভদ্র মহিলার মতো এখনো আমাদের সমাজে কত ধর্ম পাগল আছেন যারা ভাবেন ঠাকুরকে ২-৫ হাজার টাকা দক্ষিণা দিলেই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে...।

ঠিক ঐ সময় ঐ ভদ্র মহিলাও সিঁড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসছিলেন, উনি সুন্দর বাবুকে দেখেই চিনতে পেরেছেন। তাই কাছে এসে বললেন - এই যে দাদা এখন সব ধর্মস্থানেই চোর চিটিংবাজ ভরে গেছে, তাই আপনি আপনার টাকা পয়সা একটু সাবধানে রাখবেন, না হলে

যে কোন সময় বিপদে পড়বেন। সুন্দরবাবু একটু বিরক্ত হয়েই বললেন - মানে ? আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন ?

ভদ্র মহিলা একটু সপ্রতিভ হয়ে বললেন মানে আমি বলছি ওই ভিতরে আপনি যখন প্রণামী দেওয়ার জন্য পিছন পকেটে হাত ঢুকিয়ে দক্ষিণা বার করলেন তখনি তো আপনার পকেট থেকে ওই ২০০০ টাকার নোটটা মাটিতে পড়ল। হয়তো আমি বলেই আপনি ফেরৎ পেলেন। অন্য কেউ তো ফেরৎ নাও দিতে পারতো, তাই নয় কি ? তাই বলছি আর কি, আচ্ছা চলি, দাদা নমস্কার।

সুন্দর বাবু কিছুক্ষণের জন্যে নির্বাক হয়ে গেলেন এবং বুঝতে পারলেন একেই বোধ হয় বলে ''ভগবানের মার।''

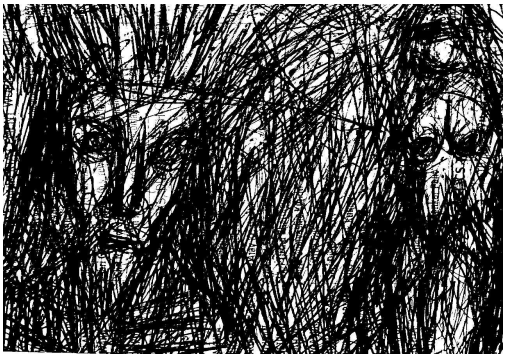

কাকের বাসায় কোকিল ছানা
নীহারুল ইসলাম

বালুটুঙ্গি হাইস্কুলের নতুন বন্ধু পান্না। পান্না তার সাথে একই সঙ্গে পড়ে। দুজনেই পঞ্চম শ্রেনীর ছাত্র। যদিও পান্না আর সে এই হাইস্কুলে এসেছে নিজ নিজ গ্রামের প্রাইমারি স্কুল থেকে। কিন্তু পান্নাকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে পান্না এই স্কুলে অপরিচিত। সবাইকে সে চেনে। সবার সাথে যেচে কথা বলে। পান্নাকেও প্রায় সকলে চেনে। শুধু সেই চিনত না। প্রথম দিন স্কুলে আসার পর পরিচয় হয়েছে। পান্না নিজেই পরিচয় করেছে। এই বলে, আমার নাম পান্না। আমি যশইতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র। বিদ্যালয়ের পাশেই আমার বাড়ি। আমার আব্বা রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। কলকাতায় থাকেন। এবার বল কী নাম তোর ? কোথায় বাড়ি ? তোর আ বার নাম কী ? তোর আ বা কী করেন ?

এভাবে কেউ পরিচয় করে রুহুলের ধারণা ছিল না। অবাক হলেও সে বলে ছিল আমার নাম রুহুল। আমার বাড়ি বিরামপুর। বিরামপুর হাইস্কুলের ছাত্র আমি। আমার আব্বা সেই স্কুলেরই মাস্টারমশাই। তারপর থেকে পান্নার সাথে রুহুলের বেশ জমে গেছে। পান্না বাড়ি থেকে বেশি বেশি টাকা আনে। তাকে ঝালমুড়ি, ঘুগনি, আইসক্রিম খাওয়ায়। পান্না অত পয়সা রোজ রোজ কোথায় পায় কে জানে! যাই হোক, ফার্স্টটার্মের পরীক্ষা সব ঠিক ছিল। তারপর থেকেই পান্না কেমন যেন বদলে গেল। পান্নার বইয়ের ব্যাগ ক্লাসরুমে থাকলেও পান্না থাকে না। কোথায় যে কী করে বেড়ায়! মাস্টারমশাইরাও তার খোঁজ রাখে না। খোঁজ রাখবে কী, ক্লাসে কী দু চারটে ছাত্র ? শ'এ শ'এ ছাত্র। অত ছাত্রের মাঝে পান্না আছে কি নেই! না থাকলে কোথায় কী করে বেড়াচ্ছে, এতবড় স্কুলের কে তার খবর রাখবে ? নাকি রাখা সম্ভব ?

কিন্তু পান্নার জন্য রুহুলের দুশ্চিন্তা হয় খুব। পান্নার ব্যাগটা তাকেই দেখে রাখতে হয়। নাম প্রেজেন্ট করেই সে যে ক্লাসরুমে ব্যাগটা রেখে পালায়, আসে ঠিক স্কুল ছুটির আগে। ভাঙা জানালা গলে কীভাবে যায়, আসে সে-ই জানে। রুহুল টেরও পায় না। তাছাড়া ব্যাপারটা নিয়ে রুহুল অত বেশী ভাবতেও পারে না। তার বুক ঢিপ ঢিপ করে। একবার প্রাইমারি স্কুলে ভাঙা জানালা গলে পালিয়েছিল রখিদ পুকুরে স্বাধীন জেলের মাছ ধরা দেখবে বলে। কিন্তু নিজেই ধরা পড়ে গেছল শিবরঞ্জন মাস্টারের হাতে। তারপর শিবরঞ্জন মাস্টারের হাতের সে কী মার! বাপরে বাপ! রুহুলের কথা ভাবতে গিয়ে তার সে কথা মনে পড়ে যায়।

পান্না একেবারে নির্বিকার। কোনও ভয়ডর নেই তার। রুহুল পান্নাকে একদিন জিজ্ঞেস

করেছিল, রোজ রোজ ক্লাসে বইয়ের ব্যাগ রেখে কোথায় যাস তুই ? মাস্টারমশাইরা যদি জানতে পারেন ? তোর ভয় করে না ?

–জানবে না হাতী। এত ছাত্র। ক'জনের খেয়াল রাখবে ? তাছাড়া আমি এমন একটা জায়গা যাই, যেখানে তুই গেলে তোরও ভয়ডর লাগবে না। তোকে একদিন নিয়ে যাবো। দেখবি খুব মজার জায়গা। গেলে তোরও ভালো লাগবে। পান্না এমনভাবে কথাগুলি বলেছিল, সে কিছুই বুঝতে পারেনি। তবু দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করতে পারেনি। কী জানি কেন, পান্নার চোখের দিকে তাকালেই সব কিছু যেন উল্টোপাল্টা হয়ে যায়। অদ্ভুত তার চোখ - চোখের মণি। যেন তাদের গ্রামের চার পাড় বাঁধানো সেই আশ্চর্য পুকুরটা! যার পানির দিকে তাকালে মানুষ সব কিছু ভুলে যায়। সে নিজেও সব কিছু ভুলে যায়। বাড়ি-ঘর! আব্বা-মা! ভাই-বোন! বন্ধু-বান্ধব! পড়াশুনা-স্কুল! খালি মনে হয় পুকুরটা তাকে কিছু বলবে আর সে শুনবে!

বাড়িতে একদিন পান্নার গল্প করছিল রুহুল। তার মায়ের সামনে। তার বোন ছিল পাশেই। ভাই ছিল না, কোথায় খেলে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু আব্বা ওই সময় কোথা থেকে এসে বাড়িতে ঢুকেছিলেন। তিনি শুনতে পেয়েছিলেন সেই গল্প। আর তাকে সাবধান করেছিলেন, খবরদার না। অমন ছেলের সঙ্গে কখনোই দস্তি নয়। ওই ধরনের ছেলেরা ভয়ঙ্কর প্রকৃতির হয়। ওদের পড়াশুনা হয় না। ফাইভ-সিক্স, বড়জোর এইট। তারপর সমাজবিরোধী কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ে। ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখলে শেষ পর্যন্ত উচ্ছন্নে যেতে হয়।

আব্বার কথায় রুহুলের মনটা ভেঙে গেছল। আব্বার কথা যদি সত্যি হয়, কী সাংঘাতিক ব্যাপার! যদিও পরে মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, মা! আব্বা যা বলল তা কি সত্যি ?

মা তাকে সাহস দিয়েছিল, তোর আব্বার সবকিছুতেই বাড়াবাড়ি। খালি সন্দেহের চোখে দেখা। তোর আব্বার কথা ছাড়। তোর যাকে ভালো মনে হবে তার সাথে মিশবি। দোস্তি করবি। দেখবি ও-ভাবেই মানুষ চিনতে পারবি। না হলে ওই ফস্টির মতো হবে ব্যাপারটা! সে জিজ্ঞেস করেছিল, কোন ফস্টির মতো মা ? ওই যে —

''দূর থেকে শুনলাম ব্যান্ড আর বাজনা

কাছে গিয়ে দেখলাম লাঠি আর লাদনা।'' – ব্যান্ড বাজনা শুনে যাবি। অথচ গিয়ে দেখবি লাঠি আর লাদনা। কিংবা লাঠি আর লাদনা দেখে ছুটে গিয়ে শুনবি ব্যান্ড-বাজনা বাজছে।

– এটা ফস্টি হবে কেন মা ? এটা তো ছড়া! সে মাকে বলেছিল। মা বলেছিল ওই একই ব্যাপার হল। ফস্টি যা ছড়াও তাই। অতি অল্পে অনেক কথা ছন্দ করে বলাটাই আসল। সেখানে ফস্টি-ছড়ার বিবাদ না লাগানোই ভালো। মা'কে রুহুলের খুব ভালো লাগে। মা এত সুন্দর করে কথা বলতে পারে। মা'কে বন্ধু মনে হয়। তাইতো সব কথা সে মাকে বলতে পারে নির্ভয়ে। আর বলতে পারে পান্নাকে।

পেছনে দেখুন...

।। দুই ।।

সময়ের অনেক আগেই স্কুলে চলে এসেছে রুহুল। এসেই স্কুলের নাইটগার্ড ভগবানদার কাছে শুনেছে আজ স্কুল ছুটি হয়ে যাবে। কী কারণে ছুটি হয়ে যাবে সেটাও জেনেছে এবং সেটা পান্নাকে বলার জন্য সে ক্লাসরুমে বসে অপেক্ষা করছে।

পান্না আসতেই খুব উৎসাহ নিয়ে সে বলল, জানিস আমাদের স্কুলের একটি মেয়ে মাধ্যমিকে পরীক্ষায় জেলায় প্রথম হয়েছে! তাই নাকি আজ স্কুল হবে না। জাতীয় সংগীতের পর স্কুল ছুটি হয়ে যাবে। - কোন মেয়েটা রে ? প্রথম হওয়ার আর সময় পেল না। কেমন যেন বিষন্ন হয়ে পড়ল পান্না। রুহুল অবাক হল। জিজ্ঞেস করল কেন তোর আনন্দ হচ্ছে না ? - না, আমার আনন্দ হচ্ছে না। স্কুল খোলা থাকলেই আমার আনন্দ হয়। বন্ধ থাকলে মন খারাপ করে। তারপর হঠাৎ পান্নাই আবার তাকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা মেয়েটা কে রে ? চিনিস ?

– চিনব কি করে এত বড়ো স্কুল! এত ছাত্র-ছাত্রী!

জাতীয় সংগীতের পর সত্যি সত্যি ঘোষণা দিয়ে স্কুল ছুটি হয়ে গেল। কিন্তু মেয়েকে ওরা দেখতে পেল না যখন - পান্না বলল, চল তো খোঁজ নিয়ে দেখি মেয়েটি কে ?

শেষ পর্যন্ত ভগবানদার কাছে খোঁজ নিয়ে ওরা জানতে পারল মেয়েটির বাড়ি এই বিরামপুরেই। খুব সাধারণ পরিবারের মেয়ে। বাবা একজন দিনমজুর। পড়াশুনোর পাশাপাশি মেয়েটি বাড়িতে বিড়ি বেঁধে রোজগার করে সংসারে সহযোগিতাও করে। পান্না রুহুলকে বলল, যাবি ?

–রুহুল জিজ্ঞেস করল, কোথায় ? ওই মেয়েটির বাড়ি ?

–ধর, তাই।

।। তিন ।।

পান্নার সঙ্গে রুহুল হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে পান্নার কথা শুনছে। পান্না বলছে, আজকে যেজন্য - যেভাবে স্কুল ছুটি হয়ে গেল সেটা একেবারেই ঠিক কাজ হয়নি। - কেন ? রুহুল জিজ্ঞেস করল।

পান্না বলল, ধর আমি ফার্স্ট হলাম। আমার জন্য স্কুলের সুনাম হল। সে কারণে স্কুল ছুটি ঘোষণা করল। অথচ 'আমি'-টা কে বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীই তা জানতে পারল না। তাহলে কার কী লাভ হল ? - কার কী লাভ বলতে ? রুহুল পান্নার কথার মানে বুঝতে পারছে না।

পান্না নিজেও বুঝতে পারল সেটা। তাই বলল, এই ধর - যে মেয়েটা ফার্স্ট হল তাকে

আমরা কেউ দেখলাম না। শুধু কীর্তির কথাটা কানে শুনলাম। সেরকম তো অনেকের কথা আমরা শুনি, পড়ি! কিন্তু ক'জনকে মনে রাখি ? অথচ মেয়েটিকে আমরা যদি চোখের সামনে দেখতাম, আমাদেরও ইচ্ছে হত ওর মতো হতে। আর আমরা দেখছি বলে মেয়েটিরও গর্ব হত। সে গর্বে সে পরে আরও উন্নতির চেষ্টা করত।

পান্নার আজকের কথা ঠিক পান্নার চোখের মতো। খুব গভীর। ঠিক যেন তাদের গ্রামের চারপাড়া বাঁধানো পুকুরটার মতো। যার দিকে তাকালে মানুষ কথা বলতে ভুলে যায়, শুধু শোনার অপেক্ষাই করে।

পান্না এত কিছু বলছে তবু সে অপেক্ষা করছে আরও কিছু শোনার জন্য।

।। চার ।।

রুহুলের আচমকা খেয়াল হয় সে হেঁটে চলেছে ধূ ধূ প্রান্তরে। খাঁ খাঁ করছে চারিদিক। গত বছর বৃষ্টি না হওয়ায় এবছর এই বসন্তেই প্রকৃতি রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে। তার মধ্যে পান্না তাকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় হেঁটে চলেছে ? মাধ্যমিকে জেলায় ফার্স্ট হওয়া মেয়েটির বাড়ি এই প্রান্তরে কোথায় ? নাকি সব মিথ্যে! পান্না মিথ্যে কথা বলে অন্য কোথাও নিয়ে যাচ্ছে ?

আব্বার কথা মনে পড়ে যায় রুহুলের, ''খবরদার না! অমন ছেলের সঙ্গে কখনোই দস্তি নয়। এই ধরনের ছেলেরা ভয়ঙ্কর প্রকৃতির হয়। ওদের পড়াশুনো হয় না। ফাইভ-সিক্স, বড়জোর এইট। তারপর সমাজবিরোধী কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ে । ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখলে শেষ পর্যন্ত উচ্ছন্নে যেতে হয়।''

তাহলে কি সে উচ্ছন্নে যাচ্ছে ?

আব্বার কথা সত্যি মনে হয় রুহুলের। সে থমকে দাঁড়ায়। - পান্না জিজ্ঞেস করল, কী হল ? দাঁড়িয়ে পড়লি যে ?

পান্নাকে সে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস আমাকে ?

পান্না বলল, একদিনেই এত ভয় পাচ্ছিস ? আমি কিন্তু রোজ আসি। আমি ভয় পাই না। আচ্ছা, এতদূর এসেছিস যখন আর একটু আয়। তাহলেই দেখতে পাবি।

রুহুল রাগত স্বরে জিজ্ঞেস করে, কী দেখতে পাবো ?

পান্না বলে ওই মেয়েটিকে। যে জেলায় মাধ্যমিকে প্রথম হয়েছে।

রুহুলের আবার মনে পড়ে যায় তাদের গ্রামের চারপাড় বাঁধানো সেই পুকুরটাকে। সবকিছু ভুলে যায় সে। পান্নাকে অনুসরণ করতে শুরু করে। আর কিছুক্ষণেই গিয়ে দাঁড়ায় এমন একটি জায়গায় যে, তার মন ভালো হয়ে যায়। চারপাশে সবুজ আর সবুজের সমারোহ। কত রকমের গাছ সেখানে। ঝোপ জঙ্গল। মেঝেতে ঘাসের বিছানা পাতা। রুহুল অভিভূত হয়ে দেখছে। পাখিদের কলকাকলি শুনছে।

হঠাৎ রুহুল লক্ষ্য করে তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে পান্না এগিয়ে যায় একটি ন্যাড়া বাবলা

গাছের কাছে। সেই গাছে একটা কাক বসেছিল, পান্নার ভয়ে কা কা করতে করতে উড়ে গেল। রুহুল দেখল। পান্নাকেও দেখাল। পান্না তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। ঈশারায় তাকে কাছে ডাকছে। যেমন ডাকে তাদের গ্রামের চারপাড় বাঁধানো সেই পুকুরটার পানি! ভয়ে আজ পর্যন্ত যে পানিতে সে নামতে পারেনি। রুহুল যাবে কিনা ভাবছে। হঠাৎ কোথা থেকে সাহস পেয়ে যায় সে। হয়ত মায়ের বলা সেই ফস্টিটা মনে পড়ে যায় তার ঃ

''দূর থেকে শুনলাম ব্যান্ড আর বাজনা
কাছে গিয়ে দেখলাম লাঠি আর লাদনা।''

রুহুল এগিয়ে যায়। ততক্ষণে পান্না সেই বাবলা গাছটায় চড়তে শুরু করেছে। তার দেখাদেখি রুহুলও চড়ে শুরু করে। একটা তিন ফাংড়ি ডালের কাছে গিয়ে পান্না থামে। পিছু পিছু খুব কষ্ট করে রুহুল সেখানে গিয়ে পৌঁছায়। পান্না তাকে কি দেখাবে, সে দেখবে। যত কষ্টই হোক না কেন ?

কিন্তু আর কোন কষ্ট হয় না তার। পান্নাকে দেখাতে হয় না, রুহুল নিজেই বুঝতে পারে। যে কাকটা এখনি উড়ে গেল তার ডিম নয় এগুলি। ওই যে কোথায় কোকিল ডাকছে, নিশ্চয়ই তার ডিম।

আনন্দে মনটা ভরে যায় রুহুলের। কোথায় যেন পড়েছিল নাকি কারও মুখে শুনেছিল ফস্টি ঃ

''কাকের বাসায় কোকিল-ছানা
আপনি কি আমার আপন না ?''

রুহুলের কানে কেউ যেন চুপিচুপি গেয়ে উঠল। হয়তো কোকিলটাই।

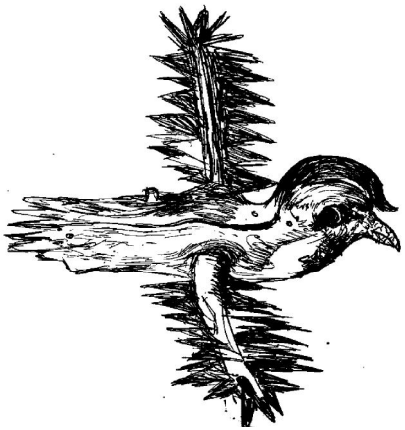

টেলিপ্যাথি

শুভশ্রী সরকার

ইণ্টারনেট দুনিয়াতে আপনি কি telepathy বিশ্বাস করেন ?

- Telepathy কি ?

'Telepathy' একটা গ্রীক শব্দ। Tele + Pathy = 'Telepathy'. যেখানে 'Tele' মানে 'দূরত্ব' এবং 'Pathy' মানে অনুভূতি/উপলব্ধি। এক কথায় বলতে গেলে, 'telepathy' হল কোন প্রকার শব্দ/সংকেত ব্যবহার না করে ভাবধারায় যোগাযোগ। 'Telepathy' ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং যেটার মাধ্যমে একটা বিশেষ অনুভূতি বা ভাবনা দুজন মানুষের মধ্যে ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও অনুভূত হয়। সাধারণত আমরা কোনও তথ্য পেয়ে থাকি আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক) মাধ্যমে। 'Telepathy' হল 6th Sense যেটার দ্বারা আমরা কোনও ঘটনা ঘটে যাওয়ার পশ্চাতে কারণ ও ফলাফলের কি সূক্ষ্ম সম্পর্ক আছে, সেটা উপলব্ধি করতে পারি। এই 6th Sense এর মাধ্যমে অদেখা পৃথিবীকে অনুধাবন করা যায়।

- কাদের মধ্যে Telepathic দেখা যায় ?

  * মনে করা হয়,যমজ সন্তানেরা একে অপরের অনুভূতি উপলব্ধি করতে পারে, যেখানে দূরত্ব ম্যাটার করে না।
  * কেউ কেউ মনে করেন, জন্মগত সূত্রে অভিন্ন হলে Telepathy আসতে পারে।
  * আবার কখনও কখনও আধ্যাত্মিক/আত্মিকভাবে Telepathy-র উদ্ভব হয়।

- কিভাবে Telepathic মেল বন্ধন আসে ?

Telepathic মেল বন্ধন আসে ভাবমূর্তি, ভাবনাচিন্তা, আবেগ অনুভূতি থেকে। কেউ যদি হাল্কা/নিশ্চিন্ত মনে গভীর চিন্তা করে, তাহলে তার মনে Telepathic Power বৃদ্ধি পায়। খোলা মনে গভীর চিন্তা করলে অনেক সময় অপ্রত্যাশিত, অহেতুক, ঘটনা বাস্তবায়িত হয়ে যায়। তবে Telepathy মানে এই নয় যে, আমি যেটা ভাবছি, সেটার ফলাফল অবিলম্বে পাব। এটা একপ্রকার তরঙ্গ, যেটা আমাদের অবচেতন/অজ্ঞান মনে প্রভাব বিস্তার করে। তবে সেটা যে সত্যিই ফলপ্রসু হবে, সেরকম কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। যখন কোন কিছু বৈজ্ঞানিক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না, তখন আসে আধ্যাত্মিক ভাবনা। বর্তমান যুগে প্রত্যেক মানুষ কর্মব্যস্ত।

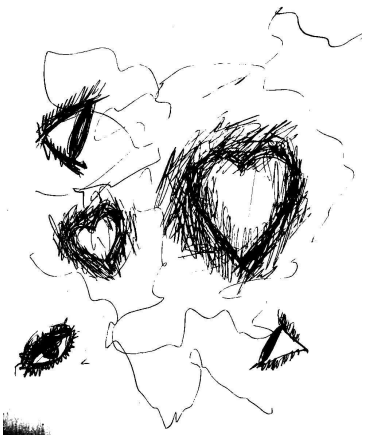

দৈনন্দিন জীবনে কর্মব্যস্ততার দরুণ মানুষ আধ্যাত্মিক জগতে মনোনিবেশ করতে পারে না। কেউ কোন সমস্যায় পড়লে সেটা নিয়ে কাউন্সেলিং করবে যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে সমাধান করতে চেষ্টা করবে, কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবনাকে মনে স্থান দেবে না। কিন্তু ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও দশ মিনিট সময় বের করে আধ্যাত্মিক চিন্তা করবে, Prayer করবে God এর কাছে, তারা তাদের মনকে অনুধাবন করে হাল্কা হতে পারবে। যেমন অনেকেই বলে থাকেন, মাত্র ২ মিনিটের জন্য বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলাম। এগুলোর কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। এগুলো মানুষ আধ্যাত্মিক ভাবেই ব্যাখ্যা করে।

- Co-incidence কি ?

এটা একটা ঘটনাবলী/পরিস্থিতির দৃষ্টান্ত, যেটা চমকপ্রদভাবে ঘটে যায়, যেখানে একটা ঘটনার সঙ্গে অপর ঘটনার কোন যোগসূত্র থাকে না। যেমন: কাকতালীয়ভাবে পুরাতন বন্ধুর হঠাৎ দেখা হওয়া।

কেউ বলতে পারে না, দুজন মানুষের মধ্যে কখন কিভাবে Co-incidently কোন ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

শহরের এক নাম করা Biology Tution Batch এ পড়তে গিয়ে নীল ও নন্দিনীর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। নীল ছেলেটি পড়াশুনায় বেশ Talanted, স্যার কোন topic পড়ানোর পর যখন জিজ্ঞাসা করত সবাই Clearly বুঝতে পেরেছে কি না, তখন ওই নীল নামের ছেলেটি স্যারকে ওই topic-related নানান Question করত। স্বভাবতই ছেলেটির Brain-Storming-Power দেখে নন্দিনী ভাবত এরা কি in born talented ? যাই হোক নীলের এই Intelligency দেখে নন্দিনী ঠিক সেদিন ভেবেছিল ছেলেটি যে কলেজে MBBS পড়বে নন্দিনী সেই কলেজেই B.Sc. Nurshing পড়বে। এইভাবে তাদের Tuition batch এ প্রথম দেখা হয়, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পর আর সেভাবে যোগযোগ হয়ে ওঠেনি। স্বাভাবিকভাবে নন্দিনী উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পর JENPARH Exam. দিয়ে B.Sc. Nurshing এ ভর্তি হল। নন্দিনীও আগে কোনদিন ভাবেনি সে সত্যি সত্যিই future এ সেবিকার Profession এ ব্রতী হবে। যাই হোক Professional line বলে Nurshing line এ চলে এল। এভাবে নন্দিনী প্রথম বর্ষ অতিক্রম করে যখন দ্বিতীয় বর্ষে উত্তীর্ণ হল, তখন একদিন সেই Medical College এর Foundation Programme এ দেখল, ওই নীল নামের ছেলেটিকে, যাকে সে প্রথম দেখেছিল Biology Tuition Batch এ। কি চমকপ্রদ ঘটনা! নন্দিনীর মনে সেই ভাবনাটা প্রথম এল যে কিভাবে তার মনের Telepathy বাস্তবায়িত হয়ে গেল। সত্যি সত্যিই সেই Medical Collge এ নীল নামের ছেলেটি MBBS পড়তে এল।

নন্দিনী যখন দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছে, তখন ওই নীল নামের ছেলেটি সদ্য ডাক্তারী পড়তে এসেছে (প্রথম বর্ষ)। পরে নীল ও নন্দিনীর মধ্যে ফেসবুক এ পরিচয় ঘটে। আলাপচারিতা মারফৎ নন্দিনী জানতে পারে প্রথমবার নীল Joint Entrance Exam এ প্রশ্নপত্রের Serial

no. mistake করায়, ওই পৃষ্ঠার MCQ গুলো পর পর ভুল marking হয়ে যায়, ফলে negative marking এর দরুণ প্রথম বছর আর তার MBBS এ Qualify হওয়া হয় নি। পুনরায় সে দ্বিতীয়বার Join Entrance Exam দিয়ে MBBS এ ভর্তি হল। নীলের জীবনে এই ঘটনাটা দুর্ভাগ্যজনক। যেটা অকস্মাৎ ঘটে গেছে। পড়াশুনোতে ভাল হওয়া সত্ত্বেও তাকে এক বছর Drop দিতে হল। সমস্ত ঘটনা শুনে নন্দিনীর সেদিন মনে হল, নীলের জীবনের এই দুর্ঘনাটি সত্যিই কি কোন Co-incidence যেটা না হলে হয়তো নীল ও নন্দিনীর জীবনে দ্বিতীয়বার আর সাক্ষাৎ হত না।

পরিশেষে বলা যায় যে, Telepathy হল একপ্রকার সম্ভাবনাময় ঘটনা। যার পেছনে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। মনের কল্পনা সত্য হলে তখনই প্রমাণিত হয় Telepathy-র অস্তিত্ব।

Society and Modernization
Tapan Sarangi

A society is supposed to be fashionable, realty, influential and distinct. It is an ordered community. So societal development cannot be thought of without modernization. Again, modernization is the process of making something acceptable and more adoptable. Without modernization a society becomes stagnant and the overall development is stupefied. No modernization, no development. And, as we know, the tools of development are science and technology. The society that adopts these tools is sure to go ahead. Otherwise it will remain standstill. And a society being stagnant gathers all sorts of dirt e.g. superstition, illiteracy, ignorance and everything that causes retardation without the blessing of science and technology no society can make progress in material field. Yes, in material sphere but real development does not only mean that development which provides us with our material needs. I mean, more than our basic needs, for our comfort and ease and luxury. For such living we actually run like squirrels in a cage and do not get peace of mind. In consonance with the development of civilization - surely with the help of modernization, we are as if squirrels rushing all the time for a glittering world. But does that glaze of life full fill all that human beings need? No in course of time we have forgot all about human qualities - humaneness is found almost nowhere. Even politics that controls every sphere of our life, is seen to be devoid of all human qualities - morality, honesty fellow - feeling, empathy and so on. For all these reasons, despite modernization, society has become contaminated in every sphere. No society now a days guarantees safe and carefree living for its members. Money-power muscle-power and politicization in everything are making our life miserable Moreover, modernization creates pollution. And the main hazard is the plastic. The more plastic or polymer is making our life easy, the more we are becoming insecure and vulnerable. So to make our life peaceful we are to get rid of not

modernization but inhuman qualities and selfishness and the more we will think about others and be moral in our attitude, the more our society will become livable,. And the young generation taking up modernization as their weapon, should acquire all moral qualities to make our society a beautiful one. And the intellectuals preparing lessons for the students have a great role to perform in this regard. The law-makers should also come forward with whole hearted desires to make the society not only developed in material world but also in cultural, spiritual and emotional sphere not surely excluding modernization. A society modernized in every sphere is healthy and happy. So, let us make our society a healthy and happy one and the new generations have a lot to do for the society with the help and advice and blessings of their elders. The ultimate equation may then run thus: Progressive **Society = Morality + Modernity**. If any of the items on the Right Hand Side is distracted, the Left Hand Side will become a Medieval Society in so-called modern age.